কাম ইজি গো ইজি

জেমস হেডলি চেজ

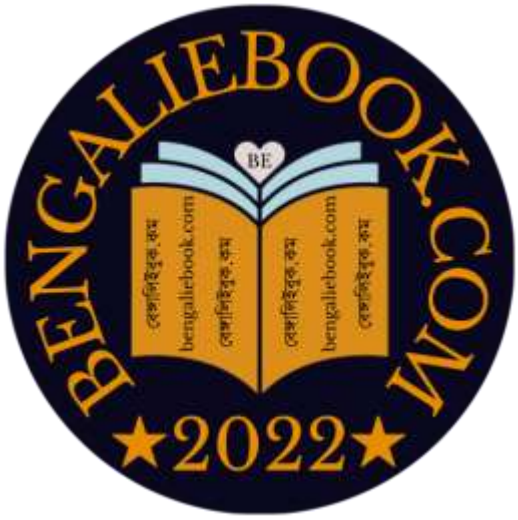

সূচিপত্র

নৈশ বিভাগের কর্মচারী.....2

ঘুম ভাঙাতে খাবার ঘরে.....68

সকালের সোনা রোদ.....126

আশঙ্কা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন.....186

নৈশ বিভাগের কর্মচারী

০১.

আমি লরেন্স সেফস্ কর্পোরেশনের নৈশ বিভাগের একজন কর্মচারী, রাত এগারোটার সময় আমার ছুটি। এখন এগারোটা বাজতে মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী। সবে ভাবছি কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে এবার কেটে পড়বো, হঠাৎ নৈশ টেলিফোনটা বেজে উঠলো। ইচ্ছা না থাকলেও এটা ধরতে হলো কেননা এটা একটা টেপরেকর্ডারে যোগ করা থাকে, ফোন বাজতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই স্বয়ংক্রিয় রেকর্ডিং শুরু হয়ে যায়। এই অদ্ভুত রেকর্ডিং-এর ব্যবস্থা করার কারণ, যাতে কর্মচারীরা কাজে কোনো ফাঁকি দিতে না পারে। অতএব রিসিভার তুলে নিলাম।

দূরাভাষে ঝংকৃত হলো বিরক্ত উদ্ধত কণ্ঠস্বর, কি ব্যাপার ফোন ধরতে এতো দেরী কেন?

আপনি কে কথা বলছেন?

হেনরী কুপার, অ্যাশলি আর্মস থেকে বলছি। খুব তাড়াতাড়ি এক জন লোক আমার এখানে পাঠিয়ে দিতে হবে। কেননা, সিন্দুকটা নিয়ে খুব অসুবিধায় পড়েছি।

এ কথা শুনে আমার মেজাজ একেবারে খারাপ হয়ে গেল। ভেবেছিলাম আজ রাতে জেনিকে সঙ্গে নিয়ে বের হবো, সে প্রোগ্রাম আর হলো না। আর এ নিয়ে এই এক মাসে

তিন-তিনবার কথার খেলাপ করতে হলো ওর সঙ্গে। রাগে মুখ থেকে অপ্রিয় কথা বেরিয়ে আসছিল কিন্তু টেপটার কথা মনে করে নিজেকে সংযত করলাম।

একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম এই টেপের কথা। এক খদ্দেরকে কিছু অপ্রিয় কথা বলায় পরদিন বস আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তাই এবারে যাতে সে ভুল আর না হয় তাই নিজেকে সংযত করলাম। গলার স্বরকে মোলায়েম করে জিজ্ঞেস করলাম, সিন্দুকটা নিয়ে কি অসুবিধায় পড়েছেন, যদি বলেন–

সিন্দুকের চাবিটা হারিয়ে গেছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লোক পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ হলো। আমি কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। কি করবো কিছু ঠিক করতে পারলাম না। জেনিকে কথা দিয়েছিলাম, ওকে সোয়া এগারোটার সময় ওর বাড়ির কাছ থেকে তুলে নেবো। তারপর দুজনে মিলে একটা নতুন ক্লাবে নাচবার জন্য যাবো। এতোক্ষণে হয়তো ও সেজেগুজে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

শহরের একেবারে অন্য প্রান্তে অবস্থিত একটা বিরাট ফ্ল্যাট বাড়ি, অ্যাশলি আর্মস। এই বাড়িটিতে শহরের নামডাকওয়ালা ধনী মহাজনদের বসবাস, ওখানে গিয়ে সিন্দুক খুলে ফিরে এসে বাস ধরে জেনির বাড়ি যেতে যেতে সাড়ে বারোটা বেজে যাবে। আর জেনি ততক্ষণ আমার জন্য অপেক্ষা করবে বলে মনে হয় না। ও আমাকে একদিন বলেছিলো, যদি আমি এইভাবে আবার কথার খেলাপ করি তবে আমার সঙ্গে ও আর কোনো সম্পর্কই রাখবে না।

মনে মনে ভাবলাম, অফিস থেকেই জেনিকে ফোন করি। কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপারে অফিসের ফোন ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। তাই বাইরে থেকে জেনিকে ফোন করবো বলে ঠিক করলাম।

কোনো উপায় না থাকায় যন্ত্রপাতির ব্যাগটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। অফিস বন্ধ করে, যখন গ্যারেজ থেকে অফিসের ট্রাক বের করছি তখন বাইরে ঝির ঝির করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। কোনো বর্ষাতি ছিল না বলে অসুবিধায় পড়লাম।

ফোন-ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। জেনির ফোন নম্বর ডায়াল করে হাত ঘড়ির দিকে তাকালাম। তখন বাজে এগারোটা কুড়ি। ফোন বাজামাত্র ও-প্রান্ত থেকে জেনির কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। মনে হলো ও যেন সারা সন্ধ্যে বসে বসে আমার এই ফোনটার জন্য অপেক্ষা করছিল।

আমার বক্তব্যটা ওকে ভালো করে বুঝিয়ে বলার আগেই ও রাগে একেবারে ফেটে পড়লো, তুমি না এলে আসবে, কোনো ক্ষতি নেই। আমি আর একজনকে চিনি, যাকে সিন্দুক সারাতে যেতে হচ্ছে না। শেট, আমি গত বারেই সাবধান করে দিয়েছিলাম, রোজ রোজ তোমার এই কথার খেলাপ আর সহ্য করতে পারছি না। এটাই আমার শেষ বার।

কিন্তু জেনি আমার আর কোনো—-। আমি আমার রিসিভারের সঙ্গে কথা বলছিলাম। বুঝতেই পারছিলাম অনেকক্ষণ আগেই লাইন কেটে দিয়েছে। ওকে আবার ফোন করলাম। কিন্তু বৃথা, ফোন বেজেই চললো, কিন্তু কেউ ধরলো না। মিনিট তিনেক অপেক্ষা করে ফোন নামিয়ে রাখলাম। শ্লথ পায়ে ট্রাকের দিকে এগিয়ে চললাম। এদিকে

তখন খুব জোরে বৃষ্টি নেমেছে। অঝোর ধারায় ঝরে চলেছে বড় বড় জলের ফোঁটা। ভারাক্রান্ত মনে ট্রাক ছুটিয়ে চললাম অ্যাশলি আর্মসের দিকে। মনে মনে লরেন্স সেফস্ কর্পোরেশনকে আর হেনরী কুপারকে যথেচ্ছ গালাগাল দিলাম।

শহরের অভিজাত অঞ্চলে বিশাল জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে অ্যাশলি আর্মস। ট্রাক থেকে নেমে বৃষ্টির মধ্যেই বাড়িটার দিকে এগিয়ে চললাম। সোজা এগিয়ে গেলাম দ্বাররক্ষীর ঘরের দিকে। তার কাছ থেকেই জানা গেল মিঃ কুপার চারতলায় থাকেন।

লিফটে চারতলায় পৌঁছে ফ্ল্যাটের বেল বাজালাম। দরজা খুললেন স্বয়ং হেনরী কুপার। লম্বা বিশাল চেহারার পুরুষ। ভাবভঙ্গীতে ঔদ্ধত্যের প্রকাশ সুস্পষ্ট। অতিরিক্ত মদ্যপানের প্রভাবে মুখে ঈষৎ লালচে আভা। তাঁর স্ফীত উদর দেখে মনে হয় তিনি অত্যন্ত ভোজন বিলাসী। আমি দেরী করে আসায় তিনি একেবারে রাগে ফেটে পড়লেন। তিনি জানতে চাইলেন, এই সামান্য রাস্তা আসতে কেন আমার এতে বিলম্ব হলো।

আমি তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলাম, বৃষ্টিতে রাস্তায় যে প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে আসতে হয়েছে সেই কারণেই আসতে দেরী হয়েছে বললাম।

কুপার দ্রুতপায়ে দেওয়ালে টাঙানো একটা অয়েল পেন্টিং-এর দিকে এগিয়ে গেলেন। ছবিটা জনৈকা স্থূলকায় মহিলার নগ্ন-মূর্তি। দেখে রুবেনস-এর আঁকা মনে হলেও সম্ভবতঃ নকল। ছবিটাকে একপাশে সরিয়ে ধরতেই চোখে পড়লো আমাদের কোম্পানির তৈরী একটা সুপার-ডি লাক্স দেওয়াল সিন্দুক।

যখন আমি যন্ত্রপাতির ব্যাগটা মেঝেতে নামিয়ে রাখছিলাম তখন আমার নজরে পড়লো পাশের লম্বা সোফাতে একটি মেয়ে শুয়ে আছে। পরনে সাদা সান্ধ্য পোশাক। পোশাকের গলার কাছটা এতো বেশী উন্মুক্ত যে মেয়েটির উদ্ধত গোলাপী স্তনের উর্ধ্বাংশ সহজেই নজরে পড়ছে। তার মাদকতায় পরিপূর্ণ রক্তিম ঠোঁটের ফাঁকে জলন্ত সিগারেট, চোখ তুলে কৌতূহলী দৃষ্টিতে ও আমার দিকে তাকালো।

মেয়েটিকে দেখে আমার জেনির কথাই মনে পড়ে গেল। কারণ ওর চুলের রঙ ও পায়ের সুন্দর গড়ন অনেকটা জেনিরই মত, কিন্তু এই মেয়েটির মধ্যে এমন একটা আভিজাত্যের ছাপ লক্ষ্য করলাম যা জেনির মধ্যে নেই। এটা স্বীকার করতেই হয় যে জেনির দৈহিক গঠন চঞ্চল করে তোলে দেহের প্রতিটি রক্ত কণিকাকে, ওর ব্যক্তিত্ব, ভারী নিতম্বের ছন্দোময় হিল্লোল, পুরুষের হৃদয়ে তোলে তুমুল ঝড়। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণই নিছক সস্তা চটক।

এই মেয়েটির মধ্যে সেরকম কিছু নজরে পড়লো না।

আমার চমক ভাঙলো কুপারের বাজখাই গলার আওয়াজে, এটা খুলতে তোমার কত সময় লাগবে?

প্রায় একরকম জোর করেই মেয়েটার দিক থেকে চোখ সরিয়ে সিন্দুকের কাছে এগিয়ে গেলাম, কম্বিনেশনটা পেলে বেশী সময় লাগবে না।

তিনি একটুকরো কাগজে কম্বিনেশনটা খসখস করে লিখে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। তারপর সোজা এগিয়ে গেলেন বিপরীত দিকের দেওয়ালে গাঁথা, ছোট একটা কাঠের

আলমারির কাছে। পাল্লা সরাতেই চোখে পড়লো ভেতরের তাকে সাজানো সারি সারি মদের বোদল। একটা গেলাস টেনে নিয়ে নিজের জন্য হুইস্কি আর সোডা মেশাতে লাগলেন কুপার।

যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ শুরু করেছি এমন সময় পাশের কোনো ঘর থেকে টেলিফোনের শব্দ ভেসে এলো। ক্রি-রি-রি-রিং–

মনে হয় জ্যাক ফোন করছে, মেয়েটিকে লক্ষ্য করে কুপার বললেন, এবং দরজা খোলা রেখেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

কুপার বেরিয়ে যেতেই মেয়েটি চাপা স্বরে হিসহিস করে উঠলো, তাড়াতাড়ি হাত চালাও চাঁদ। ব্যাটা বুড়ো আজ একটা মুক্তোর নেকলেস কিনে দেবে বলেছে। ভয় হচ্ছে, এর মধ্যে বুড়ো আবার, মত না পরিবর্তন করে ফেলে।

আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। মেয়েটির কাছ থেকে এ ধরণের কথা আমি আশা করিনি। ও সোজাসুজি আমার চোখের দিকে তাকিয়েছিলো। আমি ওকে আশ্বাস দিলাম, মিনিট তিনেকের বেশী সময় লাগবে না।

কিছুক্ষণ পরেই সিন্দুকটা খুলে ফেললাম, সিন্দুকের ভেতরে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। তিনটে তাকেই থরে থরে সাজানো একশ ডলার নোটের বাণ্ডিল। একসাথে এতো টাকা আমি জীবনে দেখিনি। সব মিলিয়ে মনে হয় পাঁচ লাখ ডলারের কম হবে না।

মেয়েটি সোফা ছেড়ে তাড়াতাড়ি সিন্দুকের সামনে এসে দাঁড়ালো, ঠিক আমার পাশে। ওর গা থেকে সেন্টের একটা উগ্র গন্ধ আমার নাকে এলো। ও আমার এতো কাছে এসে দাঁড়িয়েছে যে ওর বাহুর স্পর্শ অনুভব করলাম।

উফ, এতো টাকা! চাপা উত্তেজনায় মেয়েটি আমার হাত চেপে ধরলো, তারপর হাত ছেড়ে আমার চোখে চোখ রাখলো, আচ্ছা, আমরা দুজনেই যদি এটা খালি করার ব্যবস্থা করি, তাহলে কি রকম হবে?

পাশের ঘরে রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ শুনতে পেলাম। বুঝতে পারলাম যে কুপারের কথা বলা শেষ হয়েছে।

আমি তাড়াতাড়ি সিন্দুকের দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। মেয়েটিও চটপট সোফায় ফিরে গেলো।

কুপার এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। কি হলো? এখনও ওটা খুলতে পারোনি? রাগ করলেন তিনি। এক সেকেন্ড, স্যার, লকটা সরিয়ে দিলাম, এই তত খুলে গেছে। কুপার এগিয়ে এসে হাতল ঘুরিয়ে সিন্দুকের দরজাটা ইঞ্চি কয়েক ফাঁক করলেন, হুম–তুমি বরং একটা নকল-চাবির ব্যবস্থা করে দিও, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব।

আমি সম্মতি জানিয়ে ঘাড় নাড়লাম। তারপর যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। বেরিয়ে আসার সময় সোফাতে বসে থাকা মেয়েটিকে শুভরাত্রি জানালাম। প্রত্যুত্তরে ও ঘাড় হেলালো, দরজার কাছ পর্যন্ত পৌঁছে কুপার দুটো এক

ডলারের নোট আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হলো অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি টাকাটা আমাকে দিচ্ছেন।

ট্রাক চালিয়ে আমি ফিরে চললাম অফিসে। কুপারের টাকায় ঠাসা সিন্দুকটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। অফিসের সামান্য মাইনেতে আমি কোনো রকমে চালাই। আমি জানি ঐ মাইনেতে আমাকে চিরকাল এই একই ভাবে কাটাতে হবে। ভবিষ্যৎ বলে আমার কিছু নেই। মনের মধ্যে একটা চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগলোইচ্ছে করলে কুপারের ফ্ল্যাটে ঢুকে কতো সহজেই না হাতানো যায় ঐ টাকাগুলো! ভারী তো সিন্দুক!

বারবার মনকে বোঝালাম, এসব চিন্তা পাগলামো ছাড়া আর কিছুই নয়। তবুও মন থেকে চিন্তাটাকে দূর করতে পারলাম না।

পরদিন রাতে ডিউটি বদলের সময় ট্রেসি এলো আমার জায়গায়, তখনও ঐ একই সর্বনাশা চিন্তা উঁকি মারছে আমার মনের মধ্যে।

রয়কে আমি অনেকদিন ধরেই জানি। ছেলেবেলায় আমরা একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি। এই সিন্দুক কোম্পানিতেই চাকরি করে। আমাদের দুজনের চেহারাতে মিল আছে, তাছাড়া আর যে ব্যাপারটায় দুজনের মধ্যে মিল আছে সেটা হলো অসীম অর্থলিপ্সা।

যে ব্যাপারটায় ওর সঙ্গে আমার অমিল সেটা হলো রয়ের জীবনে মেয়েদের কোনো স্থান নেই। উনিশ বছরে রয় বিয়ে করেছিলো কিন্তু সুখী হতে পারেনি। বছর খানেক পরেই মেয়েটি ওকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। ওর যে নেশাটি রয়েছে তা হলো ঘোড়া রোগ। মাইনে

পেয়ে সমস্ত টাকাই উড়িয়ে দেয় ঘোড়ার পেছনে। যার জন্য সব সময় ওর পকেট খালি থাকে আর আমার থেকে ধার নেবার চেষ্টা করে।

ওকে কুপারের টাকার কথা বললাম। আমরা দুজন ছাড়া অফিসে আর কেউ নেই। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। জলের ছাট এসে আছড়ে পড়ছে জানলার শার্সির ওপর। আমার বাড়ি যাওয়ার কোনো তাড়া নেই। রয়কে কুপারের ফ্ল্যাটে যাওয়া থেকে আরম্ভ করে সব বললাম। এমন কি মেয়েটার কথা বলতেও ভুললাম না।

রয়ের হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, আমি জানলার কাছে এগিয়ে গেলাম। বর্ষণসিক্ত রাতের দিকে তাকালাম। বৃষ্টি তখনও অবিশ্রান্ত ভাবে ঝরে চলেছে। আমাদের মধ্যে ব্যাপারটি আলোচনা হলো।

রয় আমার দিকে তাকিয়ে বললো, পাঁচ লাখ ডলার?–তুই ঠিক জানিস?

তার চেয়ে কম বলে তো মনে হয় না,–তিনটে তাকই ভর্তি ছিলো। রয়ের চোখে দেখলাম উৎকণ্ঠার ছায়া। সে টেবিল-এ ঘুষি মেরে বললো, জানিস, মাত্র পাঁচশো ডলারের জন্য আমাকে তাড়া খাওয়া কুকুরের মতো পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে, যেমন করেই হোক কিছু টাকা আমাকে ব্যবস্থা করতেই হবে। শুধু সামান্য একটু হাতের কাজ

অসম্ভব কিছু নয়। আমার হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হলো। আমি বহুদিন থেকে এই ধরনের একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। উত্তেজনায় উঠে বসলাম ডেস্কের ওপর, সুতরাং

ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখা যাক, প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে আমাদের মধ্যে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা চললো। কাজটা খুবই সহজ বলে মনে হলো।

প্রথমেই আমাদের খোঁজ নেওয়া দরকার যে এই কুপার লোকটা রোজ কাটার সময় ফ্ল্যাট ছেড়ে বাইরে যায়, আর সময়টা জানতে পারলেই আমাদের কাজ শুরু হবে,–অর্থাৎ ফ্ল্যাটে ঢুকে সিন্দুক খুলে, তাড়াতাড়ি মাল হাল্কা করা। আত্ম প্রত্যয়ের একটুকরো বাঁকা হাসিতে রয়ের ঠোঁট নেচে উঠলো, সে আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে বললো,ঐ নকল চাবিটা নিয়ে কুপারের বাড়িতে গিয়ে দরজায় যে দারোয়ানটা থাকে, তার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করতে হবে, কথায় কথায় কুপার কখন বাড়ি থেকে বের হয় সেটা জেনে যেতে হবে। কাজটা মনে হয় খুব একটা শক্ত হবে না। ব্যাপারটা আলোচনার পর মনে হলো এর থেকে সহজ কাজ বোধ হয় আর হতে পারে না।

পর দিন রাতে নকল চাবিটা নিয়ে অ্যাশলি আমস-এ গেলাম, রয় বলেছে হাতের কাজ শেষ করেই ও অ্যাশলি আর্মসে ট্রাক নিয়ে চলে আসবে। বাইরে আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

যখন অ্যাশলি আর্মস-এ পৌঁছলাম তখন সাড়ে দশটা বেজে গেছে। ট্রাক ছেড়ে পায়ে পায়ে দ্বার রক্ষীর ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। দেখি লোকটা বসে বসে একটা পকেট বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছে। মুখে বিরক্তির চিহ্ন।

আমাকে দেখেই চিনতে পারলো। বই বন্ধ করে ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকালো, মিঃ কুপারের সঙ্গে দরকার বুঝি? কিন্তু উনি তত বেরিয়ে গেছেন। আধ ঘণ্টার আগে ফিরবেন না।

আমি বললাম, কি আর করা যাবে ওনার কাছে একটা জিনিস দেবার ছিল, এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় নেই।

ওর দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিলাম, বললাম, তুমি ঠিক জানো আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই মিঃ কুপার ফিরে আসবেন?

সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কোনও দিন তাঁর দেরী হয় না। ঠিক আটটার সময় বের হন আর রাত এগারোটার সময় ফেরেন। ডিনার খেয়ে একটার সময় আবার বেরিয়ে যান। আমিও একটা বাজলেই কেটে পড়ি। এ বাড়ির প্রত্যেকের কাছেই এ বাড়ির নকল চাবি আছে। উনি শেষ রাতে ফেরেন। একটু থেমে অপেক্ষাকৃত নীচু স্বরে ও বললো, আরে তুমি বিশ্বাস করবে না দোস্ত, কতদিন মাঝরাতে ঘুম ভাঙিয়ে আমাকে টেনে তুলেছে, কি ব্যাপার? না কোন্ শালা নাকি দরজার চাবি হারিয়ে বসে আছে। এই তো গত সপ্তাহে দরজার চাবি হারিয়ে আমাকে বিছানা থেকে টেনে তুললো। চাবি হারানোর আর সময় খুঁজে পেলো না।

কুপার কি পাঁচটার সময়েই ফেরেন নাকি?

হাঁ, তারপর সারাদিন তো পড়ে পড়ে ঘুমোয়। একেবারে অপদার্থ।

আনন্দে আমার চোখ চক্ করে উঠলো, আমার আশা পূর্ণ হয়েছে। যতটুকু জানার ছিল তা জানা হয়ে গেছে।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম লম্বা লম্বা পা ফেলে হেনরী কুপার এগিয়ে আসছেন। দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম ঠিক এগারোটা বাজে।

দ্রুত পায়ে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললাম, আপনার নকল চাবিটা নিয়ে এসেছি স্যার। আমি তাকে আরো বললাম যে, আমার মনে হয় চাবিটা ঠিক হয়েছে কিনা, সেটা একবার পরখ করা দরকার, আপনি যদি বলেন–

তিনি আমাকে ভালো করে লক্ষ্য করে বললেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমাকে অনুসরণ করতে বলে তিনি লিফটের দিকে পা বাড়ালেন।

চারতলায় পৌঁছে কুপার তার ফ্ল্যাটের দরজার কাছে এগিয়ে গেলেন। চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে আমাকে আহ্বান জানালেন। আর আমিও তার পেছন পেছন বসবার ঘরে প্রবেশ করলাম।

হেনরী কুপার ছবিটা সরিয়ে আমাকে চাবিটা পরীক্ষা করার জন্য ইশারা করলেন। আমি চাবি ঘুরিয়ে সিন্দুক খোলার চেষ্টা করলাম। কুপার ঠিক আমার পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার ছোট ছোট চোখ জোড়া সিন্দুকটির ওপর নিবদ্ধ।

হাতল ঘুরিয়ে টান মারতেই সিন্দুকের দরজা খুলে গেলো। চোখের সামনে আবির্ভূত হলো চোখ ধাঁধানো কুবেরের সম্পদ।

কিছুক্ষণ পরে সিন্দুক বন্ধ করে কুপারকে চাবিটা এগিয়ে দিলাম। তিনি চাবিটা নিয়ে পকেটে ঢোকালেন। এবারে আমি কুপারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লিফটে পা দিলাম। রাস্তায় নেমে বৃষ্টির বেগকে উপেক্ষা করে ক্ষিপ্রপায়ে হেঁটে চললাম। বৃষ্টির ফোঁটায় ঝাপসা পর্দা ভেদ করেও দেখা যাচ্ছিলো অদূরে দাঁড়ানো ট্রাকটাকে। ট্রাকে বসে রয় আমার জন্য অপেক্ষা করছিলো। আমি ট্রাকে উঠতেই রয় স্টার্ট দিয়ে ট্রাক ছুটিয়ে চললো বৃষ্টিভেজা রাস্তা ধরে, আমি এবং রয় ঠিক করলাম রবিবার দিনটাকেই কাজে লাগাবো।

দেখতে দেখতে এসে গেল সেই আকাঙ্ক্ষিত দিনটি। রয় আগে থেকেই একটা গাড়ি ভাড়া করে রেখেছিলো। রাত তখন প্রায় সাড়ে বারোটা ও আমার বাড়িতে এলো। আমি অবশ্য তৈরী হয়েই ছিলাম। বৃষ্টির মধ্যেই দৌড়ে গিয়ে গাড়িতে উঠলাম। এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে রয় গাড়ি ছুটিয়ে দিলো অ্যাশলি আর্মসের দিকে। আমরা দুজনেই চুপচাপ। কারো মুখে কোন কথা নেই। কেমন একটা নিঃশব্দ উৎকণ্ঠা অনুভূত হচ্ছিল। শুধু অনুভব করলাম বুকের মধ্যে অশান্ত হৃৎপিণ্ডের দাপাদাপি। বৃষ্টি পড়ার জন্য রাস্তা একেবারেই ফাঁকা। ঠিক একটা বাজতে পাঁচ মিনিটের সময় আমরা অ্যাশলি আর্মসে পৌঁছলাম।

সারি সারি গাড়ি পার্ক করা রয়েছে রাস্তাটায়, একটা ক্যাডিলাক এবং একটা প্যাকার্ডের মাঝে গাড়িটা ঢুকিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করলো রয়। এবার শুরু হলো আমাদের উদগ্রীব প্রতীক্ষা। আমরা পলকহীন চোখে চেয়ে রয়েছি অ্যাশলি আর্মসের সদর দরজার দিকে। শ্বাস-প্রশ্বাসের গভীর শব্দ পরিষ্কার ছন্দে শোনা যেতে লাগলো। উত্তেজনায় শরীরের প্রতিটি স্নায়ু কাঁপছে।

ঘড়িতে তখন রাত একটা। চোখ তুলে তাকাতেই দেখলাম একজন লোক বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসছে। আমি রয়ের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, রয়ের ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি।

কুপার রাস্তায় এসেই মাথা ঝুঁকিয়ে দৌড়তে শুরু করলো। আমাদের গাড়ি থেকে কিছুটা দূরে রাখা ছিলো একটা সাদা জাগুয়ার। হাত দিয়ে বৃষ্টির বেগ প্রতিহত করতে করতে জাগুয়ারটার দিকে এগিয়ে গেলে কুপার। গাড়িতে উঠেই গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টিভেজা অন্ধকার গ্রাস করলো সাদা জাগুয়ারটাকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দ্বাররক্ষীকে আবার এগিয়ে আসতে দেখা গেলো। তারপর চাবি ঘুরিয়ে বন্ধ করে দিলো সদর দরজা। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল বাড়ির অপর প্রান্তে। সিঁড়ি ভেঙে নামতে শুরু করলো।

রয় বললো, আর দেরী করা ঠিক হবে না। আমি যন্ত্রপাতির ব্যাগটা শক্ত হাতে চেপে ধরলাম। গাড়ি থেকে নেমে আমরা বাইরে আসতেই বৃষ্টির জল একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লো গায়ে, মুখে, মাথায়। সদর দরজা লক্ষ্য করে আমরা ছুটে গেলাম। আগে থেকেই আমরা সব ঠিক করে রেখেছিলাম। আমার কাজ হবে তালাটা ভোলা, আর রয় চারপাশে লক্ষ্য রাখবে। কোনো বিপদের আশঙ্কা দেখলেই আমাকে সতর্ক করে দেবে।

দরজার কাছে পৌঁছে হাঁপাতে হাঁপাতে পকেট থেকে চাবি ভর্তি রিংটা বের করলাম। চটপট রিংটা খুলে নিয়ে তালাটার দিকে মনোযোগ দিলাম।

এমনিতে এ ধরনের তালা খোলা আমার কাছে কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। কিন্তু ভয়ে আমার হাত কাঁপছিলো। তাই তালা খুলতে একটু বেশী সময়ই আমার লেগে গেলো।

অতি সন্তর্পণে দরজাটা ফাঁক করলাম, তারপর আমি আর রয় নিঃশব্দে ভেতরে পা বাড়ালাম। বেড়ালের মতো ক্ষিপ্র গতিতে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চললাম।

আমরা আগে থেকেই ঠিক করে ছিলাম যে লিফট ব্যরহার করবো না। কারণ দ্বাররক্ষী যদি হঠাৎ বিছানা ছেড়ে উঠে আসে, তবে লিফটের আলো দেখে ঠিক সন্দেহ করবে।

আমরা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলাম। যখন কুপারের ফ্লাটের সামনে পৌঁছলাম তখন আমরা রীতিমতো হাঁপাচ্ছি। পকেট থেকে চাবির রিংটা বের করে একটা চাবি লাগাতেই খুলে গেলো ফ্ল্যাটের দরজা। হাতের চাপে ফাঁক হয়ে গেল দরজার পাল্লা। ঘরে নিচ্ছিদ্র অন্ধকার আমাদের গ্রাস করলো। ঘরে ঢুকে প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে সজাগ রাখার চেষ্টা করলাম। কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করলাম সামান্যতম শব্দ। উৎকণ্ঠায় স্নায়ু যেন ভেঙে পড়তে চাইছে।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সুইচ বোর্ডের কাছে এগিয়ে গেলাম, আলো জ্বালোম। ধবধবে মার্কারী ল্যাম্পের চোখঝলসানো আলোয় ঘর ভেসে গেলো। রয় ভেতরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিলো। এবারে আমরা দেরী না করে অয়েল পেন্টিংটার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। ছবিটা একপাশে সরাতেই সামনেই সিন্দুক। রয় তাড়া লাগালো। কম্বিনেশন নম্বরটা আমার মখস্থ ছিল। তাছাড়া সঙ্গে ছিলো সিন্দুকের নকল চাবি।কুপারের চাবিটা

তৈরী করার সময় এটাও তৈরীকরিয়ে নিয়ে ছিলাম। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই খুলে ফেললাম সিন্দুকের দরজা।

আমরা দুজনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে হাঁকরে চেয়ে রইলাম টাকার পাহাড়ের দিকে।রয় আনন্দে বলে বসলো, তা হলে বাকি জীবনটা পায়ের ওপর পা তুলে বসেই কাটিয়ে দেওয়া যাবে কি বলল? সত্যিই পৃথিবীতে এর থেকে সহজ কাজ বোধ হয় আর হতে পারে না। আমার বুকের মধ্যে আনন্দের ঢেউ আছড়ে পড়লো। কতক্ষণ যে আমরা ঘোরের মধ্যে ছিলাম জানি না, একটা শব্দে আমাদের চমক ভেঙে গেলো। হঠাৎ একটা শব্দ কানে এলো। আমরা ঘাড় ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকালাম।

একটা চাবির অগ্রভাগ বেরিয়ে আছে চাবির ফুটো দিয়ে, চাবিটা ধীরে ধীরে ঘুরছে। আমাদের আতঙ্ক বিস্ফারিত চোখের সামনেই ক্লিককরে একটা শব্দ হলো এবং চাবিটা ফুটো থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলো, আমি তখন জড় পদার্থের মতন অচল-অনড়। দেহের সমস্ত অনুভূতি যেন জমে বরফে পরিণত হয়েছে, দেখলাম রয় হঠাৎ পাগলের মতো ছুটে গেলো সুইচবোর্ড লক্ষ্য করে, আর একই সঙ্গে ঘুরতে শুরু করলো দরজার হাতলটা। অর্থাৎ কেউ বাইরে থেকে দরজা খুলছে।

রয় সুইচ অফ করার সঙ্গে সঙ্গে একরাশ অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়লো ঘরের মধ্যে। পর মুহূর্তে ধীরে ধীরে ফ্ল্যাটের দরজা খুলতে লাগলো। বারান্দার একফালি আলো ঘরে এসে পড়লো। দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে গেলো। রয়কে অন্ধকারে দেখতে পেলাম না। শুধু দেখলাম দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে সেই আগের দিনের দেখা মেয়েটি। কিছুক্ষণ আমরা বারান্দা থেকে ঠিকরে আসা আলোয় পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

পরক্ষণেই মেয়েটির তীক্ষ্ণ আর্ত চীৎকারে চমকে উঠলাম, চোর চোর!

হেনরী–ঘরে চোর ঢুকেছে–আমি স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার পা দুটো যেন কেউ মেঝের সঙ্গে আটকে রেখেছে। দেখলাম, কুপার এসে দাঁড়িয়েছে মেয়েটির পিছনে। এক ঝটকায় মেয়েটিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে কুপার আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। চোখের দৃষ্টিতে যেন আক্রোশের লেলিহান শিখা।

আমি তখন আতঙ্কে কি করবো ঠিক করতে পারছি না।

মেয়েটি ঝড়ের বেগে সিঁড়ি লক্ষ্য করে ছুটে গেলো। ওর তীক্ষ্ণ কানফাটানো আর্তচীৎকারে গোটা বাড়িটা কেঁপে উঠতে লাগলো। এবারে রয়কে আমি দেখতে পেলাম। জাগুয়ারের মতো গুঁড়ি মেরে দেওয়াল ধরে এগিয়ে চললো দরজার কাছে। কুপারের ঠিক পেছনে। কুপার রয়কে দেখতে পায়নি, সে সোজা এগিয়ে আসছিলো আমার দিকে। দু-হাত বাড়িয়ে সে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই কিছু একটা ঝলসে উঠলো রয়ের হাতে। একটা জোরে শব্দ হলো। কুপারের বিশাল দেহ গোড়াকাটা কলাগাছের মত লুটিয়ে পড়লো আমার পায়ের কাছে।

লক্ষ্য করলাম, রয়ের দুহাতে, বজ্র মুষ্ঠিতে ধরা রয়েছে সেই ভারী ফুলদানিটা। অর্থাৎ হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে, ঐ ফুলদানিটাই কুপারের মাথায় বসিয়ে দিয়েছে রয়।

আমি যেন এতক্ষণ দেখা দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে উঠলাম। এখন একটাই চিন্তা আমার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগলো, আমাকে পালাতে হবে। আমি আর দেরীনা করে পাগলের

মতো দৌড়োতে লাগলাম। আতঙ্কে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটে চললাম। নীচ থেকে মেয়েটির গলা ফাটানো আর্তচীৎকার তখনও শোনা যাচ্ছে। আমার মাথায় তখন একটাই চিন্তা–যে করে থোক আমাকে গাড়ির কাছে পৌঁছতে হবে।

রয়ের চাপা গলা শুনতে পেলাম, শেট, নীচে নয়–ওপরে আয়–ওপরে। ওর কথা আমার আচ্ছন্ন মনে কোনো রেখাপাত করলো না। এক লাফে তিনটে করে সিঁড়ি ভেঙে উন্মাদের মতো ছুটে চললাম।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তিনতলায় পৌঁছলাম। নীচের তলার সিঁড়ি লক্ষ্য করে দৌড়োতে শুরু করলাম। কিন্তু হঠাৎ পা পিছলে মুখ থুবড়ে পড়লাম। কোন রকমে উঠে দাঁড়িয়ে আঘাত গ্রাহ্য না করে আবার দৌড়োলাম। ছুটতে ছুটতে অবশেষে দালানে এসে উপস্থিত হলাম।

মেয়েটি তখন দ্বাররক্ষীর অফিসের কাছে দাঁড়িয়ে, দরজার হাতল ধরে টানাটানি করছে। আমার দিকে নজর পড়ায় মেয়েটি আমাকে অবাক হয়ে দেখতে লাগলো। তারপর শুরু করলো আর্ত চীৎকার। কিছুক্ষণ পরে দ্বাররক্ষী এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার উপর। দুজনে জড়াজড়ি করে পড়লাম মেঝের ওপর। ওর শক্ত হাতের বাঁধন ছাড়িয়ে আমি শুধু কোনরকমে পালাতে পারলেই বাঁচি।

ভয়ে মরিয়া হয়ে লোকটার চুলের মুঠি ধরে মেঝেতে সজোরে ঠুকে দিলাম। তাতেও যখন কোনো ফল হলো না তখন দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে একটা ঘুষি বসিয়ে দিলাম

ওর মুখে। তারপর গায়ের জোরে লোকটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ছুটতে শুরু করলাম সদর দরজা লক্ষ্য করে।

দরজা খুলে ঠিক বাইরে পা দিচ্ছি এমন সময় বেজে উঠলো কানফাটানো এক পুলিশি-হুঁই। নিশ্চয়ই এটা দ্বাররক্ষীর কাণ্ড!

মেয়েটির বীভৎস চীৎকার, আর এই হুই-এর কানফাটানো শব্দে বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মতো চমকে উঠলাম। প্রাণের মায়া ত্যাগ করে রাস্তা লক্ষ্য করে দৌড়তে লাগলাম।

বৃষ্টি পড়ছে অঝোরে আর আমি সেই বৃষ্টির মধ্যে ছুটে চলেছি। কানে তখনও ভেসে আসছে সেই চীৎকার। ভয়ে আমার হৃৎপিণ্ড যেন বুক ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

ছুটতে ছুটতে একবার পিছন ফিরে তাকালাম দেখলাম একটা ছায়ামূর্তি দৌড়ে আসছে আমার পেছন পেছন। তার মাথায় টুপি, কোটের বোতামগুলো অন্ধকারেও ঝকমক করছে পুলিশ। ভয়ে আমার শরীর অবশ হয়ে এলোমনে মনে ভাবলাম একবার গাড়িতে গিয়ে উঠতে পারলেই হলো। সামনেই আমাদের গাড়িটা দেখা যাচ্ছে। নতুন আশা নিয়ে প্রাণপণে গাড়ি লক্ষ্য করে ছুটে চললাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই রাত্রির নিস্তব্ধতাকে খান খান করে ভেসে এলো রিভলবারের শব্দ–উঃ আমার গাল ছুঁয়ে একটা আগুনের হলকা বেরিয়ে গেলো।

মনে হলো যেন আমার গালের চামড়া পুড়ে গেল। যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করলাম।

মাথা নীচু করে রাস্তার অপর প্রান্ত লক্ষ্য করে ছুটে চললাম, সেদিকটা সম্পূর্ণ অন্ধকার। যদি ওখানে পৌঁছতে পারি তবে পালাবার আশা আছে।

ছুটতে ছুটতে আবার শুনতে পেলাম সেই কালান্তক রিভলভারের শব্দ–উঃ। পরমুহূর্তেই প্রচণ্ড এক ধাক্কায় ভিজে রাস্তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম। মনে হলো কেউ যেন একটা উত্তপ্ত লৌহশলাকা বিঁধিয়ে দিয়েছে আমার পিঠে। যন্ত্রণায় চীৎকার করতে গেলাম, কিন্তু গলা দিয়ে কোনো স্বরই বের হলো না। নিজের অজান্তেই একটা হাত চলে গেলো পিঠে। হাত সামনে আনতেই দেখলাম হাতময় রক্ত। সেই রক্ত বৃষ্টির জলে ধুয়ে টন্ টন্ করে গড়িয়ে পড়ছে–একে একে আমার প্রতিটি অনুভূতি অবশ হয়ে আসতে লাগলো–

কানে আসতে লাগলো কয়েক জোড়া ভারী বুটের শব্দ–খট-খটখট–মনে হলো কারা যেন আমার দিকে দৌড়ে আসছে তীর বেগে।

উঃ কী ভীষণ অন্ধকার! মাগো

এরপর আর আমার কিছুই মনে নেই।

.

০২.

অনেক দূর থেকে ভেসে আসা কথাবার্তার শব্দ শুনতে পেলাম। মনে হলো কেউ যেন ফিসফিস করে কথা বলছে–অনেক-অনেক অনেক দূর থেকে

ক্রমশঃ চেতনা ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুকে একটা অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করলাম। একে একে সেই যন্ত্রণাটা তীব্র থেকে তীব্রতর হলো। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালাম। দুধ সাদা চার দেওয়ালে ঘেরা ঘরের মধ্যে শুয়ে আছি আমি। আমার মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছে একটা মুখ। দুটো উদগ্রীব চোখ স্থির লক্ষ্যে আমার দিকে চেয়ে আছে। এক সময় সেই মুখের ছবিটা অস্পষ্ট হয়ে কেঁপে কেঁপে মিলিয়ে গেলো। বুকের মধ্যে তীব্রতর হলো সেই অসহ্য যন্ত্রণা, চোখ বন্ধ হয়ে এলো। কিন্তু ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো মনের পর্দায় ছবির মতো একে একে ভেসে উঠতে লাগলো। মনে পড়ে গেলো পাগলের মতো সিঁড়ি ভেঙে দৌড়োনোর কথা, দ্বাররক্ষীর সঙ্গে ধস্তাধস্তি, মেয়েটির বীভৎস আর্তচীৎকার, অন্ধের মতো রাস্তা লক্ষ্য করে আমার ছুটে যাওয়া–সব একে একে মনের পর্দায় ছবির মতো ফুটে উঠলো।

রাতারাতি বড়লোক হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে এই হলো পরিণতি। আমি আজ আহত অবস্থায় হাসপাতালের বিছানায় আর আমার সামনে দাঁড়িয়ে ভীষণাকৃতি এক পুলিশ সার্জেন্ট-একেই বলে ভাগ্য।

কিছু কিছু কথা আমার কানে আসতে লাগলো–আপনি তো বলছেন, এর আঘাত নাকি ততোটা গুরুতর নয়, তাহলে ব্যাটা নিশ্চয় মটকা মেরে পড়ে আছে। কলার ধরে তুলে এক লাথি ঝাড়লেই সুড়সুড় করে জ্ঞান ফিরে আসবে। সার্জেন্টের শ্লেষ ভরা অধৈর্য কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

না না–তাড়াহুড়ো করাটা ঠিক হবে না সার্জেন্ট, লোকটা অল্পের জন্য বেঁচে গেছে। গুলিটা আর একটু বাঁদিকে ঘেঁষে গেলেই। শান্ত ভদ্র কণ্ঠস্বর, সম্ভবতঃ ডাক্তারের।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বেশ ভালোরকম বুঝতে পারছি। চোখ পিট পিট করে তাকালাম। বিছানার পাশে দুজন লোক দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথম জনের চেহারা মেদবহুল, মুখে প্রশান্তির ভাব, গায়ে একটি সাদা আলখাল্লা। নিশ্চয়ই ইনি ডাক্তার। দ্বিতীয় জন ছোটখাটো পাহাড়ের মতো। ভোতা নাক পাতলা বেঁটে আর ছোট ছোট হিংস্র চোখ। পরনে তেলচিটে ময়লা পোশাক। কিন্তু তার টুপি পরার ধরণ দেখেই বুঝলাম যে এ ব্যাটা নিশ্চয়ই পুলিশের লোক।

চুপচাপ শুয়ে বুকের যন্ত্রণা সহ্য করছি। হঠাৎ রয়-এর কথা মনে পড়লো। রয় যদি ঠিকমতো সবার অলক্ষ্যে অ্যাশলি আর্মস ছেড়ে পালাতে পেরে থাকে, তবে ওর আর জড়িয়ে পড়ার কোনো ভয় নেই। কারণ কুপারের টাকা প্রথম দিন আমার চোখেই পড়েছিলো, দ্বাররক্ষীর সঙ্গে আমিই গল্প করেছিলাম। আমাকেই লোকেরা সিঁড়ি ভেঙে উন্মাদের মতো ছুটতে দেখেছে। সুতরাং মনে হয় রয়ের কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই।

এক অজানা আতঙ্ক হঠাৎ মনের মধ্যে এসে ভিড় করলো।

কুপারের কিছু হয়নি তো? মনে পড়ে গেলো একটা ভারী ফুলদানি দিয়ে রয় এক আসুরিক শক্তি নিয়ে কুপারের মাথায় বসিয়ে দেয়।

একটা বিশ্রী গন্ধ নাকে এলো। ধীরে ধীরে চোখ খুলে দেখলাম এক সার্জেন্টের হিংস্র মুখ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে।

সার্জেন্টটি তার বীভৎস মুখ আমার মুখের ওপর নামিয়ে এনে বললো, ঢের হয়েছে। এবা দয়া করে মুখ খুলুন দেখি, আপনার শ্রী মুখের বাণী শোনার জন্য গত দুদিন ধরে ঠায় দাঁড়ি, আছি।নেকড়ের মত দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসলো সে। শুরু হলো পুলিশের হাতে নর যন্ত্রণা।

ওদের একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল কাজটা আমি একা করিনি। তাই বিভিন্ন রকম প্র করে ভয় দেখিয়ে আমার মুখ থেকে কথা বের করতে চাইলো। ওদের কথা থেকে বুঝ পেরেছিলাম, রয়ের উপস্থিতির কোনো প্রমাণই পুলিশের হাতে নেই। এমনকি কুপারের খুনে দায়ে আমাকেই পড়তে হবে বলে ভয় দেখালেও আমি মুখ খুললাম না।

অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে ওরা ক্ষান্ত হলো। একথা বললো যে কুপার সেরে উঠেছে আমার বুঝতে কষ্ট হলো না যে কুপারের সেরে ওঠাটা ওরা ভালো চোখে দেখছে না। সার্জেন দাঁত খিঁচিয়ে আমার দিকে তাকালো, কুপার বেঁচে গেছে বলে ভেবোনা যে, তুমিও বেঁচে যাবে এ আঘাতে কুপার মারাও যেতে পারতো। তবে ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই বাছাধন, তোমার দশ বছরের ঘানি ঘোরানো কেউ আটকাতে পারবে না–হ্যায়না হাসির সঙ্গে ওর বিশাল দেহট কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো।

হাসপাতাল থেকে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো জেল হাজতে। সেখানে তিনমাস কাটানোর পর জানতে পারলাম, কুপার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে।

একে একে বিচারের দিন এগিয়ে আসতে লাগলো। চিরকাল আমার এই দিনটা মনে থাকবে আদালতে এসে চারিদিকে চোখ বোলালাম। যদি কোনো পরিচিত মুখ নজরে

পড়ে যায়। হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে চোখে পড়লো জেনি দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখতে পেয়েই ও হেসে হাত নাড়লো।

আমি অবাক চোখে তাকিয়ে রইলাম। আমি ভাবতেই পারিনি যে জেনি এখানে আসবে আমার সঙ্গে দেখা করতে।

তারপরই চোখ পড়লো, আমার বস ফ্রাঙ্কলিনের ওপর; আর তার পাশে ভিজে বেড়ালের মতো চুপটি করে বসে আছে রয়।

রয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হলো–ওর মুখ পাণ্ডুর। মনে হলো এই তিনমাস শুধু ভেবেছে সে, ওর নাম আমি পুলিশকে জানিয়েছি কি না।

এবারে বিচারপতির দিকে চোখ পড়লো, কোটরগত অনুভূতিহীন চোখ। সারা মুখ জুড়ে এক অদ্ভুত কাঠিন্য, দেখা গেলো যে সাক্ষীর কাঠগোড়ার দিকে কুপার এগিয়ে আসছে, মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা, চোখমুখ বিবর্ণ।

কুপার শপথ নিলো। তারপর সিন্দুক খোলার জন্য আমাকে ডেকে পাঠানো থেকে শুরু করেনকল চাবির কথা, ওকে আক্রমণ করার কথা–একে একে সব বলে গেলো। কিছুই বাদ দিলো না।

এরপর কাঠগোড়ায় এসে উপস্থিত হলো, কুপারের ফ্ল্যাটে দেখা সেই মেয়েটি। ওর পরণে একটা চাপা আকাশ-নীল পোশাক। আদালতের সমস্ত লোক, এমন কি বিচারপতি পর্যন্ত ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো।

মেয়েটি যা বিবৃতি দিলো তার থেকে জানা গেলো যে, মেয়েটি কুপারের একটা নাইট ক্লাবে গান গায়। সেদিন একটা গানের রিহার্সাল দিতে ও কুপারের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলা, এরকম ও মাকে মধ্যেই যায়। সেদিন কুপার ফোন ধরতে পাশের ঘরে গেলে, আমি যে সিন্দুক খুলে টাকাগুলে দেখেছিলাম, সেকথার ওপর মেয়েটা একটু বেশী জোর দিল।

আমাকে খুব অবাক করে দিলো ফ্রাঙ্কলিনের সাক্ষ্য। তিনি কাঠগোড়ায় উঠে আমার প্রশংসাই করলেন। আমি যে তার কোম্পানির একজন বিশ্বাসী ও সুদক্ষ কর্মচারী, সেকথা তিনি বিচারপতিকে বার বার জানালেন।

এরপর আমার উকিল উঠে দাঁড়িয়ে আদালতের কাছে আমার জন্য করুণা ভিক্ষা করলেন অর্থাৎ এই আমার প্রথম অপরাধ, সুতরাং বিচারপতি যেন শাস্তির ব্যাপার একটু চিন্তা করে দেখেন। তার কৃপা প্রার্থনার ভঙ্গী দেখে মনে হলো, আমি দোষী সাব্যস্ত হওয়াতে তিনি বেশ আনন্দিত হয়েছেন। এরপর তিনি চেয়ারে বসে কতকগুলো কাগজপত্র ওল্টাতে লাগলেন, মনে হলো ওগুলো এর পরবর্তী মামলার কাগজপত্র। এক কথায় উকিলটি বেশ বুদ্ধিমান। আমার মামলা নিয়ে ফালতু সময় নষ্ট করে যে আর লাভ নেই, সেটা তিনি বেশ বুঝতে পেরেছেন।

এরপর কানে এলো বিচারপতির গম্ভীর কণ্ঠস্বর, শেট কারসন, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদি বিচার করে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে, তুমি দোষী। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। যেহেতু এটাই তোমার প্রথম অপরাধ, সেহেতু অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমাকে লঘুদন্ড দিতে আমি আইনসঙ্গত ভাবে বাধ্য। তুমি যেভাবে মিঃ হেনরী কুপারকে আক্রমণ

করেছে, তাতে তোমার হিংস্র মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া একটি সুপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানির সুনাম তুমি ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছ। কারসন, যে কোম্পানিতে তোমার বাবা এবং ঠাকুরদা বিশ্বস্তভাবে কাজ করে আছেন, তুমি তাদেরই বংশধর হয়ে এই হীন কাজ করেছে, একথা ভাবতেও তারা লজ্জাবোধ করবেন।

বিচারপতির কোনো কথাই তখন আমার কানে ঢুকছে না। আমি শুধু বিচারপতির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম আর ভাবতে লাগলাম আমার শাস্তির মেয়াদ কত বছরের? পাঁচ-দশ-না পনেরো?

সমস্ত বিচার করে আমি তোমাকে ফাওয়ার্থ বন্দীশিবিরে দশ বছরের নির্বাসনদণ্ড দিলাম। বিচারপতি উঠে দাঁড়ালেন।

আমার পা দুটো থরথর করে কাঁপতে লাগলো। প্রচণ্ড ক্ষোভ আর আফশোসের রুদ্ধ কান্না সমস্ত সত্ত্বাকে ভেঙে খানখান করে দিলো।

আগামী দশটা বছরের কথা চিন্তা করে হৃদপিণ্ড আতঙ্কে কুঁকড়ে গেলো। মনে হলো গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে উঠি। দোহাই হুজুর, আমাকে কুড়ি–পঁচিশ-যত বছর খুশী কারদণ্ড দিন, কিন্তু ফার্ণওয়ার্থ–ভাবতেই পারছি না।

হঠাৎ আমার মাথার মধ্যে এক অদ্ভুত চিন্তা এসে ভীড় করলোরয়ই তো এসবের জন্য দায়ী। যদি কুপারকে না মারতো তবে তো আমাকে ফার্ণওয়ার্থে যেতে হতো না। হয়তো পাঁচ বছর জেল খেটেই রেহাই পেতাম।–শুধু রয়ের জন্যই আজ আমাকে ফার্নওয়ার্থে যেতে হচ্ছে।

এখন মুক্তি পাবার একমাত্র পথ রয়ের নাম জানিয়ে দেওয়া। মনস্থির করে নিয়ে এক ঝটকায় দাঁড়ালাম। মুখ তুলতেই চোখ পড়লো রয়ের চোখে।

ফ্রাঙ্কলিনের পাশে সোজা হয়ে রুদ্ধশ্বাসে বসে আছে রয়। আতঙ্ক-উৎকণ্ঠায় ওর মুখ মৃতের মত বিবর্ণ! সমস্ত রক্ত কেউ যেন শুষে নিয়েছে।

রয়ের দিকে চেয়ে মনে পড়লো আমাদের ছেলেবেলার কথা। সেই যখন আমরা একসঙ্গে স্কুলে পড়তাম–গাছ থেকে ফল পাড়তাম–মাছ ধরতাম। এমনি আরও কতো ছোট ছোট ঘটনা ছবির মত ভেসে উঠলো মনের পর্দায়।বয়ই ছিলো আমার একমাত্র বন্ধু–এবং এখনও আছে। ওর দিকে তাকিয়ে আশ্বাসের হাসি হাসলাম। বোঝাতে চাইলাম যে, তোর কোনো ভয় নেই রয়। যততক্ষণ আমি বেঁচে আছি, এতটুকু বিপদের ছোঁয়া তোর গায়ে লাগতে দেবো না। চোখের জল গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো। রয়ের দিকে চেয়ে হাত নাড়লাম। ওর মুখ ঝাপসা হয়ে এলো।

পেছন থেকে কনস্টেবলের ধাক্কা খেলাম। ধীরে ধীরে আদালতু ছেড়ে এগিয়ে চললাম। শেষ বারের মতো জেনির দিকে তাকালাম, ও কাঁদছে, হ্যাঁ সত্যিই ও আমার জন্য কাঁদছে।

ডুকরে কেঁদে উঠলাম। জলভরা চোখে ফিরে তাকালাম রয়ের দিকে। ওর চোখেও জল। মুখে কৃতজ্ঞ হাসি। যেন মুক্ত–আমি ওকে রেহাই দিয়ে গেলাম।

স্পষ্ট দেখতে পেলাম সামনে অপেক্ষা করছে অন্ধকার ভবিতব্য আর অসীম নরক–ফানওয়ার্থ! রক্তজমানো একটা হিমেল স্রোত বয়ে গেলো শিরদাঁড়া বেয়ে।

একটা কথা ভেবে সান্ত্বনা পেলাম যে আমার বন্ধু রয়ের সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আমি ওকে বাঁচবার সুযোগ দিয়েছি। নিজের বিবেকের কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে না বারবার মনে হতে লাগলোরয়ের সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি-ও আমার বন্ধু ছিলো–আছে এবং থাকবে।

এই ফার্নওয়ার্থ বন্দীশিবির হলো জমাট দুঃস্বপ্নের কুৎসিত নরক। কাগজপত্রে এই বন্দীশিবিরের বীভৎসতা নিয়ে বহুবার লেখালেখি হয়েছে। রাষ্ট্রপ্রধানকে বারবার অনুরোধ করা হয়েছে এই শিবির বন্ধ করার জন্য। তিনি ব্যাপারটা ভেবে দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

জার্মান সৈন্যরা নাৎসী বন্দী শিবিরের জন্য আজও বিখ্যাত। সেখানে তারা অকথ্য অমানুষিক অত্যাচারের যেসব উপায় বের করেছিলো তা শুনে আজও সাধারণ মানুষের বুক কেঁপে ওঠে কিন্তু এহেন কুখ্যাত নাৎসী বন্দীশিবিরকেও হার মানতে হয়েছিলো ফার্নওয়ার্থের কাছে। এর বীভৎসতা নাকি কল্পনা করা যায় না।

খবরের কাগজের লেখা প্রবন্ধগুলো যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে ফার্নওয়ার্থকে নরকেরও নরক ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। সাধারণ জেলের মতো ফার্নওয়ার্থের চারিদিকে বিশাল উঁচু পাঁচিল এবং কয়েদীদের কুঠরি আছে, একথা ভাবলে ভীষণ ভুল করা হবে। ওসবের কোনো বালাই ফার্নওয়ার্থে নেই। এখানে কয়েদখানা বলতে ধূ ধূ করছে এক

বিশাল তেপান্তরের মাঠ তার মাঝে একটা ঘর। পঞ্চাশ ফুট লম্বা, দশ ফুট চওড়া। ঘরে ঢোকবার একটাই দরজা, নিরেট লোহার তৈরী। এছাড়া মোটা লোহার গরাদ বসানো একটা ছোট্ট জানলা আছে–তাও প্রায় মাটি থেকে বিশ ফুট উঁচুতে। সেটা দিয়ে খুব সামান্যই আলো আসে।

পাহারাদার হিসেবে দিনের বেলায় আছে বন্দুকবাজ প্রহরীর দল, এদের মধ্যে ছজন অশ্বারোহী। তাদের শক্তিশালী রাইফেল দিয়ে দু-মাইল দূর থেকেও লক্ষ্যভেদ করা যায়। বহুদূরে দেখা যায় এক চিলতে রূপোলী রেখানদী। তার তীরে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত নলখাগড়ার ঝোঁপ। এছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না।

অর্থাৎ দিনের বেলা ফার্নওয়ার্থ থেকে পালাবার চেষ্টা করা আত্মহত্যারই সামিল। দিনের বেলা ফার্নওয়ার্থ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

আর রাতের প্রহরী হলো একপাল রক্তলোপ হিংস্র হাউন্ড। তাছাড়া কয়েদিরা যাতে পালাতে না পারে তাই তাদের পায়ে লাগানো থাকে ভারী লোহার শেকল।

সবকিছু জেনেও প্রথমদিন ফার্নওয়ার্থে পা দিয়েই ঠিক করলাম যেভাবেই হোক এই জীবন্ত নরক ছেড়ে আমাকে পালাতে হবে। এখানে দশ বছর থাকলে পাগল হতে বাধ্য। এই নরককুণ্ডে দশ বছর কাটানোর চেয়ে মৃত্যুও অনেক ভালো। যে করে হোক–যেমন করে থোক আমাকে পালাতেই হবে।

দেখতে দেখতে দশটা দিন কেটে গেলো। সকাল হলেই প্রহরীরা এসে আমাদের মাঠে নিয়ে যায়। নাম ডাকা হয়ে গেলে পোশাক ছেড়ে খালি গায়ে আমাদের কাজে যেতে হয়। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য।

সাতাত্তর জন বিভিন্ন চেহারার কয়েদী দল বেঁধে এগিয়ে চলেছি–আর আমাদের দু-পাশে ঘোড়ায় চড়ে চলেছে তিনজন করে প্রহরী।

এরপর চলে পাথর ভাঙার কাজ। কাঠফাটা রোদে, খালি গায়ে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাথর ভাঙতে হয়। দূরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সেই ছজন ঘোড়ায় চড়া প্রহরী। এছাড়া আর যে ছজন আছে, তারা পায়চারী করে বেড়ায়। হাতে তাদের ধরা থাকে শঙ্করমাছের লেজ দিয়ে তৈরী লিকলিকে চাবুক। কারো কাজে সামান্যতম ঢিলেমি দেখলেই সেই চাবুক সপাৎ করে আছড়ে পড়তে খোলা পিঠে। চামড়া ফেটে দরদর করে রক্ত ঝরে পড়ে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা অমানুষিক পরিশ্রমের পর শ্রান্ত ক্লান্ত আমরা রক্তাক্ত দেহে ফিরে চলি কয়েদখানার দিকে। দিনের আলো ধীরে ধীরে নিভে আসতে থাকে। চারিদিকে কেমন এক ক্লান্ত অথচ স্নিগ্ধ ভাব ফুটে ওঠে। দূরের কোন গির্জা থেকে ভেসে আসে ঢং ঢং আওয়াজ। সারা রাতের কথা মনে পড়লেই গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসে। কারণ ফার্নওয়ার্থের দিনগুলো যেমন বীভৎস, তার চেয়েও ভয়াবহ এর রাতগুলো।

কয়েদখানার ভেতরে ঢুকলেই চোখে পড়ে দেওয়ালে গাঁথা লোহার জালের তৈরী শোবার তাক। একটার নীচে একটা–তার নীচে আর একটা-এইরকম অসংখ্য তাক। ঘরে

টিমটিম করে জ্বালা থাকে কয়েকটা মাত্র লণ্ঠন। যার আলো কয়েদখানার পরিবেশকে ভয়াবহ করে তোলে। লোহার জালের ছায়াগুলো ঘরের নোংরা তেলচিটে দেওয়ালে কেঁপে কেঁপে উঠে একটা অমানুষিক নারকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে।

সাতাত্তর জন কয়েদীকে গরু-ছাগলের মতো ঢোকানো হয় সেই ঘরে। দুর্গন্ধে ভরে ওঠে গোটা ঘরটা। স্নানের অভাবে আর অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রত্যেককেই এখন পাগলের মতো দেখায়, একরাশ ধুলো ভরা মাথার চুলে জট, গালভরা খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ। চোখে-মুখে হতাশা।

যে যার তাকে উঠে পড়ে শোবার আশায়। প্রহরীরা এসে প্রত্যেকের পায়ে শেকল লাগিয়ে তালা এঁটে দেয়। তারপর লণ্ঠনগুলো নিয়ে চলে যায়। নিঃসীম, জমাট অন্ধকারে ঘর ভরে যায়।

তার বের করা লোহার জালের ওপরেই গা এলিয়ে দিতে হয়। এতোটুকু নড়বার কোনো উপায় নেই। কারণ প্রত্যেকের পায়ের শেকলই একটা বিরাট লম্বা শেকলের সাথে বাঁধা। এই বিরাট শেকলটা, কয়েকটা আংটার সাহায্যে সেই পঞ্চাশ ফুট লম্বা ঘরের চার দেওয়ালের গা দিয়ে আটকানো, এমনভাবে যে কেউ যদি একটুও নড়াচড়া করে তবে বড় শেকলে টান পড়ার জন্য অন্যান্য সমস্ত কয়েদীর পায়েই টান পড়ে, এবং তাদের ঘুম ভেঙে যায়। নরকেও বোধ করি এর চেয়ে আরামে থাকা যায়। ঘুমের ঘোরে কোনো কয়েদী যদি আচমকা পাশ ফেরে, তবে শেকলে টান পড়ে ঘুম ভেঙে যাওয়ার জন্যে পাশের কয়েদী হিংস্রভাবে তার সঙ্গে মারামারি শুরু করে দেয়। অন্ধকারেই ভেসে আসে আর্ত চীৎকার।

এই ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে বারে বারেই আমার মনের মধ্যে পালিয়ে যাবার চিন্তাটা ঘোরাফেরা করতে লাগলো।

ফার্নওয়ার্থে রক্ষীর সংখ্যা মোট বারোজন। রাত হলে ওরা সকলেই ঘরে ফিরে যায়–শুধু একজন ছাড়া। তার নাম বাইফ্লিট। ওর কাজ, কুকুরগুলোকে দেখাশোনা করা। বাইফ্লিটের চেহারায় এমন একটা আদিম হিংস্র ভাব আছে যে রক্ত লোলুপ হাউন্ডগুলো পর্যন্ত ওকে দেখলে ভয় পায়। দিনেরবেলা কুকুরগুলো একটা বড়সড় লোহার খোঁয়াড়ে বন্ধ থাকে আর ওদের খাওয়ানো হয় দিনে মাত্র একবার। যার জন্য হাউন্ডগুলো বাঘের চেয়েও হিংস্র হয়ে থাকে।

রাত আটটার সময় অন্যান্য প্রহরীরা চলে গেলে বাইফ্লিট পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় কুকুরের খোয়াড়ের দিকে। ওর হাতে তখন থাকে একটা ভারী মোটা লাঠি। সেটা ঘোরাতে ঘোরাতে ও গিয়ে খুলে দেয় খোয়াড়ের দরজা। একে একে বেরিয়ে আসে হিংস্র হাউন্ডের দল।

বাইফ্লিটের চেহারা দৈত্যের মতো বিশাল। বীভৎসকুৎসিত মুখ, ইচ্ছামতো ও কুকুরগুলোকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ভোর চারটের সময় কুকুরগুলোকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসে। খোয়াড়ে।

রাত্রে আমার ঘুম আসে না। তাই রাতের পর রাত জেগে কাটাই আর শুনি ক্ষুধার্ত সারমেয় দলের রক্ত হিম করা গর্জন। রাতে শুয়ে পালাবার কথা চিন্তা করলেই নির্মম রসভঙ্গের মতো শুনতে পাই হাউন্ডগুলোর হিংস্র গর্জন। পায়ের তালা লাগানো শেকল বা

ঘরের লোহার দরজা, এ দুটোর কোনোটাই আমার কাছে সমস্যা নয়। কারণ প্রথম রাতেই আমার লোহার জাল দিয়ে। তৈরী শোবার তাক থেকে অতিকষ্টে ইঞ্চি তিনেক লম্বা একটুকরো তার ভেঙে রেখেছিলাম। আঙুল কেটে রক্ত বের হলেও মন ভরে গিয়েছিলো আনন্দে। ঐ তার এবং সামান্য সময় পেলে ফার্নওয়ার্থের যে কোনো তালাই আমি খুলে ফেলতে পারি। সিন্দুক কোম্পানি আমাকে মন ভরার মতো পয়সা না দিতে পারলেও, পৃথিবীর কঠিনতম তালা কি ভাবে খুলতে হয় সেটা শিখিয়ে দিয়েছে। তারপর থেকেই পালাবার চিন্তাটা আরো জমাট বেঁধেছে আমার উর্বর মস্তিষ্কে। কিন্তু রাত্রিতে হাউন্ডগুলোর হিংস্র গর্জন মনটাকে দমিয়ে দেয়, পালাবার চিন্তা করতে ভয় হয়।

দিনরাত মনে হয়, কিভাবে কুকুরগুলোর একটা ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু কিছুই আর মাথায় আসে না।

রোজ ভোরবেলা নাম ডাকার সময়, খোঁয়াড়ের পাশ দিয়ে যেতে যেতে অসহায় ভাবেঅধভুক্ত কুকুরগুলোর দিকে চেয়ে দেখি। আমাদের দেখেই ওরা শিকার দেখার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে খোঁয়াড়ের গরাদের গায়ে।

চোখের সামনে ভেসে উঠলো একটা দৃশ্য : একটা লোক রাতের অন্ধকারে ছুটছে আর তার পেছন পেছন নিঃশব্দে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলেছে দশটা হাউন্ড। মুহূর্তের মধ্যে কুকুরগুলো ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর।

দাঁতে নখে ছিঁড়ে ফালা ফালা করে ফেললো তার দেহ। ওঃ কি ভয়ানক!

ফার্নওয়ার্থে প্রায় একমাস কাটানোর পর আমাকে ঢোকানো হলো রান্নাঘরের কাজে। সেখানে আমাকে জল তুলতে হয়, বাসন মাজতে হয়, মশলা পিষতে হয়–মশলা বলতে শুধু মরিচ। প্রত্যেক কয়েদীই এই কাজটাকে ভীষণ ভয় করে। এর চেয়ে বাইরে পাথরভাঙা ওদের কাছে অনেক ভালো।

বন্দীদের জন্য যা খাবার তৈরী হয় সে আর বলার নয়। দুর্গন্ধে পেটের নাড়িভুড়ি সব বেরিয়ে আসে। বিশ্রী গন্ধকে চাপা দেওয়ার জন্য পাঁচক ঐ মরিচের গুড়ো ব্যবহার করে থাকে। ঐ ধরনের পরিস্থিতিতে আমাকে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়। একদিন এই মরিচ পিষতে পিষতেই কুকুরগুলোকে বোকা বানাবার মতলব আমার মাথায় এলো। মনে মনে ভাবলাম রান্নাঘরের কাজটা নিয়ে বেশ ভালোই হয়েছে, বেশ উৎসাহ পেলাম। এতোদিনে একটা উপায়ের মতো উপায় খুঁজে পাওয়া গেল।

পর পর কয়েকদিন রান্নাঘরের কাজ করার পর কয়েদখানায় ফেরার সময় লুকিয়ে লুকিয়ে পকেটভর্তি করে মরিচের গুঁড়ো নিয়ে এলাম। পাঁচক জানতেই পারলো না। সেই মরিচকে একটা ছোট্ট পুটলি করে আমার শোবার তাকের এককোণায় লুকিয়ে রাখলাম। কারণ এই মরিচই এখন আমার প্রাণ।

এইভাবে পালাবার পথে আমি দু-ধাপ এগিয়ে গেলাম।

প্রথমতঃ দরজা খুলতে আমার অসুবিধা হবে না আর দ্বিতীয়তঃ কুকুরগুলোকে অনুসরণ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য আমার সঙ্গে রয়েছে মরিচ। সুতরাং এ দুটো জিনিসের সাহায্যে আমি মাঠ ছাড়িয়ে অন্ততঃদূরে নদীর কাছে পৌঁছতে পারবে। আর তারপর লুকোবার

জন্যে নদীর পাড়েই তো রয়েছে ঘন নলখাগড়ার ঝোঁপ। সুতরাং ফাঁকা মাঠ পার হয়ে নদী পর্যন্ত আমাকে পৌঁছতে হবে। তারপরই ভরসা ঐ নলখাগড়া।

এসবকথা ভাবতে ভাবতেই কয়েকদিন পেরিয়ে গেলো। কোনো সমাধানেই পৌঁছতে পারলাম না। তারপর একদিন-রয়ের কাছে থেকে শেখা,কুপারের দারোয়ানকে পটানোর বুদ্ধির কথা মনে পড়লো-আর দেরী না করে পরদিন সকালে রান্নাঘরে পৌঁছেই রাধুনি ব্যাটার সঙ্গে সুযোগ বুঝে সুখদুঃখের গল্প জুড়ে দিলাম। আমি কায়দা করে জেনে নিলাম প্রহরার ব্যাপারটা। বাইফ্লিটের গতিবিধির কথা ওর থেকেই জেনে নিলাম।

প্রতিদিন রাত আটটায় অন্যান্য প্রহরীরা বাইফ্লিটের ঘাড়ে সব দায়দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে ঘুমোতে চলে যায়। বাইফ্লিট কয়েদখানার দরজায় তালা দিয়ে খোঁয়াড়ে গিয়ে কুকুরগুলোকে ছেড়ে দেয়। তারপর অদুরে এক কুঁড়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। ভোর চারটের সময় বাইফ্লিট কুঁড়েঘর ছেড়ে বেরিয়ে রান্নাঘরে যায়। সেখানে কুকুরগুলোর জন্যে দুটো ঝুড়িতে মাংসের ছাঁট রাখা থাকে। সেই ঝুড়ি দুটো নিয়ে বাইফ্লিট খোঁয়াড়ে যায়। কুকুরগুলোও ওকে অনুসরণ করে। খোয়াড়ের ভেতর ঢোকার পর ওদের খাওয়া শুরু হয়। শুয়ে শুয়েই শোনা যায় কুকুরগুলোর বীভৎস চীৎকার। কেউ কেঁউ শব্দ শুনলেই মনে হয় বাইফ্লিট লাঠি দিয়ে প্রয়োজন মতো মারছে। এমনি করে কিছুক্ষণ যাওয়ার পর সাড়ে চারটের সময় খেয়াড় বন্ধ হয়ে যায়। তার পরেই শোনা যায় বৈদ্যুতিক বাঁশীর কানফাটানো শব্দ–এটাই ছিল বাইফ্লিটের প্রতিদিনের সংকেত। এরপরই কয়েদীরা জেগে যায়। এই নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম হয় না। ঠিক করে ফেললাম, যখনই বাইফ্লিট চারটের সময় কুকুরগুলোকে খাওয়াতে শুরু করবে, তখনই কয়েদখানার দরজা খুলে ছুট লাগাবোসোজানদীর দিকে।

হাতে সময় খুব কম পাওয়া যাবে পালাবার জন্য। তবুও তার মধ্যেই পালাতে হবে। ঠিক মতো মাথা ঠাণ্ডা রেখে যদি দৌড়োতে পারি তবে নদী পর্যন্ত পৌঁছতে মিনিট ছয়েকের বেশী লাগবে না। তারপর থেকেই কুকুরগুলোকে ধোঁকা দেবার জন্য মরিচের গুঁড়ো কাজে লাগাবো। প্রহরীরা যদি খুজতে বের হয় তবে তখনকার মতো নলখাগড়ার ঝোপে গা ঢাকা দিলেই হবে। সকলের চোখ এড়িয়ে চলার পক্ষে রাতের অন্ধকার আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করবে। এইভাবে শুধু রাতের অন্ধকারই আমাকে সাহায্য করবে রেললাইন পর্যন্ত পৌঁছতে। ফার্নওয়ার্থ থেকে রেললাইনের দূরত্ব কুড়ি মাইল। সেখানে পৌঁছতে পারলে আর কোনো ভয় নেই। যে কোনো ট্রেনে উঠে ওকল্যান্ডে নামলেই হলো। এই জেলার মধ্যে ওকল্যান্ডই সবচেয়ে বড় শহর। সেখানে লোকের ভিড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে বেশী সময় লাগবে না।

আমার সামনে এখন একটা বিরাট সমস্যা রয়েছে। পায়ে লাগানো শেকলের তালা খুলতে আমার কয়েক সেকেন্ড মাত্র লাগবে। কিন্তু কয়েদখানার ভারী দরজা খোলা অতো অল্প সময়ে হবে না। ওই দরজা খোলার সময় অন্য কোন কয়েদী যদি জেগে ওঠে এবং চীৎকার শুরু করে দেয়, আর তা যদি বাইফ্লিটের কানে যায় তাহলেই সর্বনাশ হবে।

পালাবার পথে যখন এতোটা এগিয়ে এসেছি তখন এই সামান্য সমস্যার নিখুঁত কোনো সমাধান না করে এক পা-ও এগোচ্ছি না। তাতে যদি দু-একদিন দেরী হয় তো হোক।

হঠাৎ বয়েডের কথা আমার মনে পড়ে গেলো–ওকে দিয়েই কাজ হবে।

প্রত্যেক কারাগারেই এমন একজন কয়েদী থাকে যাকে অন্যান্য কয়েদীরা তার দৈহিক শক্তির জন্য ভয় পায়। এখানেও এমনি এক মস্তান আছে তার নাম জো বয়েড। বয়েড লম্বায় পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চির বেশী হবে না, কিন্তু চওড়ায় সাধারণ মানুষের দ্বিগুণ। মুখভর্তি কাটা দাগ। সম্ভবতঃ ছুরির আঘাতেই হয়েছে। নাকটা মুষ্টি যোদ্ধাদের মতো চ্যাপ্টা। জ্বলজ্বল করছে কুতকুতে দুটো চোখ। মোট কথা বয়েডের চেহারা অনেকটা গরিলার মতো।

বয়েডের শোবার তাক আমার ঠিক নীচেই। জানতাম ওকে যদি পটিয়ে আমার সঙ্গে টানতে পারি তাহলে দরজার তালা খোলার ব্যাপারে আর অসুবিধা হবে না। তবে বয়েডকে বোঝানো একটু অসুবিধা হবে, কারণ ও কারো সঙ্গেই কথা বলে না। সবসময় নিজের মনে চুপচাপ বসে থাকে। এসব ভাবতে ভাবতে অর্ধেক রাত পার হয়ে গেলো। শুয়ে শুয়ে বয়েডের শ্বাস-প্রশ্বাসের গভীর শব্দ শুনতে লাগলাম। ভাবলাম ওকে আমার মতলবের কথা জানাবো। হাজার হোক ও বন্দী তো, মুক্তির স্বাদ গ্রহণের ইচ্ছা ওর নিশ্চয়ই হবে।

রাত তখন প্রায় দুটো। ঠিক করলাম বয়েডকে সব বলবো। এটুকু ঝুঁকি আমাকে নিতেই হবে না হলে পালানো সম্ভব হবে না।

মন ঠিক করে পায়ে লাগানো শেকলের তালা খুলে ফেললাম। উপুড় হয়ে লোহার জালের ফাঁক দিয়ে তাকালাম। নিকষ কালো অন্ধকারের মধ্যে কিছুই চোখে পড়ে না। অ্যাই বয়েড! চাপা ফিসফিস স্বরে ওকে ডাকলাম।

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেলো শ্বাস-প্রশ্বাসের ভারী শব্দ। অন্ধকারে কিছু দেখা না গেলেও বুঝলাম ওর সন্দেহঘন জ্বলজ্বলে চোখজোড়া আমার দিকেই তাকিয়ে আছে।

সে চাপা স্বরে জানতে চাইলো, কি ব্যাপার!

আমি বললাম, আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আমি এখান থেকে পালিয়ে যাচ্ছি। তুমি কি আমার সঙ্গে আসবে?

বয়েড যেন আমার কথা বিশ্বাস করতে পারলো না।

আমি বললাম, বাইফ্লিট যখন কুকুরগুলোকে খাওয়াতে শুরু করবে সেই সময়েই সুযোগ বুঝে আমরা পালাবো নদীর দিকে। সেখান থেকে রেললাইন ধরে এগিয়ে যাবো। তুমি রাজী থাকলে বলো তোমার পায়ের শেকল খুলে দিই। আমারটা আমি খুলে ফেলেছি।

বয়েড সব শুনে রাজী হলো। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে নীচে নামলাম তারপর তারের টুকরোটা দিয়ে কাজ শুরু করলাম। মিনিটখানেকের মধ্যে তালাটা খুলে ফেললাম। শেকলটা খুলে ঠং করে জালের ওপর পড়লো।

আমরা দুজনে ঠিক করলাম বাইরে বেরিয়েই একসঙ্গে নদীর দিকে ছুটবে। সেখানে পৌঁছে দুজনে দুদিকে যাবো। বাইফ্লিট সম্ভবতঃ কুকুরগুলোকে আমাদের পেছনে লেলিয়ে দেবে; কিন্তু কোনোরকমে যদি নদীটা পার হতে পারি তবে কুকুরগুলো আর আমাদের গন্ধ পাবে না।

আমরা অপেক্ষা করে থাকলাম আসন্ন মহেন্দ্রক্ষণের জন্য।

কয়েদখানার দেওয়ালে ভোরের হালকা রূপোলী আলোর আভা জানলা দিয়ে এসে পড়েছে। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দরজার তালায় হাত লাগাবো। মরিচের পুটলিটা তাকের কোণা থেকে বের করে জামার ভিতর গুঁজে নিলাম। ভুলেও এর একটি কণাও আমি বয়েডকে দিচ্ছিনা। এর প্রতিটি কণাই আমার কাজে লাগবে। এই মরিচের গুঁড়োর ওপরেই আমার মরণ-বাঁচন নির্ভর করছে।

স্থির চোখে জানলার দিকে চেয়ে আছি সোনালী রোদের আশায়। কানে আসছেবয়েডের শ্বাস প্রশ্বাসের গভীর শব্দ।

কানে এলো হাউন্ডগুলোর হিংস্র গর্জন, ভয়ে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো।

ঐ–ঐ হাউন্ডগুলো বয়েডের স্বর ভয়ে কাঁপছে। বুঝলাম ও ভীষণ ভয় পেয়েছে।

আশ্চর্য! বয়েডের মতো বুনো গরিলা পর্যন্ত ঐ কুকুরগুলোকে ভয় পায়!

সময় যেন আর কাটতে চায় না। ক্রমে উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষার অবসান হলো। কয়েদখানার ছোট্ট জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঠিকরে পড়লো এক ফালি সোনালী রোদ। একসময় বুঝতে পারলাম যে আমাদের পালাবার সময় ঘনিয়ে এসেছে।

উত্তাল হৃৎপিণ্ড আছড়ে পড়ছে বুকের খাঁচায়। আর অপেক্ষা করতে হলো না। কানে এলো কুকুরগুলোর উল্লসিত চীৎকার। অর্থাৎ বাইফ্লিট ওর কুঁড়েঘর ছেড়ে রান্নাঘরে যাচ্ছে। না–আর দেরী নয়।

দুজনে তাক থেকে মেঝেতে লাফিয়ে নামলাম। ঘর ভর্তি সব কয়েদী ঘুমে অচেতন। নিঃশব্দে আমরা দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। তালাটা যতটা শক্ত ভেবেছিলাম ততোটা শক্ত নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজা খুলে গেলো। ভাগ্য ভালো বলতে হবে, কেননা কয়েদীরা কেউ জেগে উঠলো না। বাইরে বাইফ্লিটের ধমকানির শব্দ শুনে বুঝলাম কুকুরগুলো এখন খেতে ব্যস্ত।

আস্তে আস্তে দরজা ফাঁক করে বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় পা রাখলাম। আমার পেছন পেছন বয়েড বাইরে এলো। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে দূরে খোয়াড়ের দিকে তাকালো। ও ভয় পেয়েছে বুঝতে পেরে ওকে মারলাম এক ধাক্কা। বয়েড চটপট বলে সঙ্গে সঙ্গে শুরু করলাম দৌড়। লম্বা লম্বা পা ফেলে হাওয়ার বেগে ছুটে চললাম।

বয়েড আমার মতো জোরে দৌড়োতে পারছে না তাই ও আমার থেকে অনেক পিছনে রয়েছে। চারিদিকে ধু ধু প্রান্তর তার ওপর দিয়েই ছুটে চলেছি। লক্ষ্য দূরের নদী। নিজেকে বড়ো বেশী অসহায় মনে হতে লাগলো। জোরে দৌড়োবার চেষ্টা করছি।

হঠাৎ–ভোরের শান্ত পরিবেশের নিঃস্তব্ধ পর্দা বিদীর্ণ করে ভেসে এলো রিভলভারের শব্দ-ছুটতে ছুটতে চকিতে পেছনে তাকালাম।

বাইফ্লিট খোয়াড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। ওর হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা একটা ৪৫ বোরের রিভলভার।

বয়েড এঁকেবেঁকে দৌড়োচ্ছিলো। ওর ঠিক হাত পাঁচেক দুরে রিভলভারের একটা গুলি বেরিয়ে গেলো। আমি আরো জোরে ছুটতে শুরু করলাম।ছুটতে ছুটতে আর একবার পেছনে তাকালাম। বয়েড প্রায় দুশো গজ পিছিয়ে পড়েছে।

পরমুহূর্তে কানে এলো সেই বৈদ্যুতিক বাঁশির কান ফাটানো শব্দ। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই অশ্বারোহী রক্ষীরা আমাদের পেছনে ধেয়ে আসবে।

তাড়াতাড়ি নলখাগড়ার ঝোঁপের মধ্যে লুকিয়ে পড়লাম। তাড়াতাড়ি ঝোঁপ ভেদ করে নদীর কিনারায় পৌঁছে বাঁদিকে এগিয়ে চললাম। পাড় ধরে একশো গজ মতো গিয়ে আবার ঢুকে পড়লাম দুর্ভেদ্য নলখাগড়ার ঝোপে, লুকিয়ে পড়লাম।

কয়েক সেকেন্ড বাদে বয়েড ঝোঁপ ভেদ করে নদীর পাড়ে এসে দাঁড়ালো। আমার থেকে প্রায় বিশ গজ দূরে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে আমাকে খুঁজতে লাগলো। কিন্তু ঝোঁপের মধ্যে আমাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হলো না।

আমার একেবারেই ইচ্ছা নয় যে বয়েড আমার সঙ্গে আসুক। আমি পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে পড়ে রইলাম।

বয়েড নদীতে নামতে শুরু করলো। দু-একবার থেমে পিছনে তাকালো। তারপর জলে নেমে বলিষ্ঠ হাতে জল কেটে সাঁতরে এগিয়ে চললো ওপারে।

এবারে মরিচের পুটলিটা বের করে প্যান্টের গোড়ালির ভাঁজগুলো ঐ গুঁড়ো দিয়ে ভর্তি করলাম যাতে ছোটবার সময় মরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ে আমার পায়ের গন্ধ ঢেকে দেয়।

ঝোঁপ ছেড়ে বেরিয়ে দ্রুত পায়ে নদীর পাড় ধরে এগিয়ে চললাম। কিছুটা যাবার পর ছুটতে শুরু করলাম। একটু পরেই কানে এলো ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। ঝড়ের বেগে নদীর দিকে ছুটে আসছে প্রহরীরা। এখুনি গা ঢাকা না দিলে আর উপায় নেই। লুকোবার একটা ভালো জায়গা খুঁজতে লাগলাম।

বুকের ভেতর কেউ যেন হাতুড়ি পিটছে–ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে উঠেছে। ঝোঁপের মধ্যে আশ্রয় নিলাম। একটু পরেই শুনতে পেলাম খস খস শব্দ। রক্ষীরা ঝোঁপ ভেদ করে নদীর দিকেই আসছে।

হঠাৎ এক প্রচণ্ড উল্লসিত চীৎকারে চমকে উঠলাম। পরক্ষণেই কানে এলো জলে কারা যেন আঁপিয়ে পড়লো। মনে হলো হয়তো কোনো প্রহরী ঘোড়া নিয়ে নদী পার হয়ে ওপারে যাচ্ছে।

রাইফেলের শব্দ পেলাম। আর একটি ঘোড়া নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। কানে ভেসে এলো একাধিকবার গুলির শব্দ।-উৎকণ্ঠা আতঙ্কে মাথা গুঁজে পড়ে রইলাম।

ওরা কি তাহলে বয়েডকে দেখতে পেয়েছে?–অদম্য কৌতূহলে মাথা তুললাম। দেখি, একজন অশ্বারোহী প্রহরী ঘোড়া নিয়ে সাঁতরে ওপারে যাচ্ছে–হাতে তার স্বয়ংক্রিয়

রাইফেল। কানে এলো কানফাটানো শব্দ–হঠাৎ দেখি বয়েড ওর লুকোনো জায়গা ছেড়ে এক লাফে নদীতে এসে পড়লো। লক্ষ্য করলাম নদীর ওপাড়ের রক্ষীটি তার ঘোড়া থেকে নেমে রাইফেল বাগিয়ে তাক করছে বয়েডকে লক্ষ্য করে। সাঁতার কাটতে থাকলেও বয়েড বোধহয় আন্দাজ করেছিলো এই আসন্ন বিপদের কথা। কারণ হঠাৎই ও জলের মধ্যে ডুব দিলো। সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলের গর্জন-গুলির আঘাতে খানিকটা জল ছলকে উঠলো শূন্যে।

দেখলাম আর একজন প্রহরী দেরী করে ঘোড়া নিয়ে জলে নেমে পড়লো। ঘোড়াটা সাঁতরে বেশ কিছুটা এগিয়েছে এমন সময় বয়ে ভেসে উঠলো। প্রহরীটি বয়েডকে দেখতে পেয়েই ঘোড়াটাকে সেদিকে এগিয়ে নিয়ে চললো। মুহূর্তের মধ্যে বয়েড আবার ডুব দিল।

বয়েড বোধহয় বুঝতে পারছিলো এভাবে সাঁতার কাটলে ও নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছোতে পারবে না তাই ও ডুব সাঁতার দিয়ে প্রহরীটির দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। একটু পরেই দেখলাম লোকটার পেছনে ভেসে উঠেছে। মনে মনে বয়েডের বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারলাম না।

প্রহরীটি বয়েডকে দেখতে পায়নি কিন্তু ওপাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি ওকে দেখতে পেয়েই বিকট চীৎকার করে উঠলো, ওই যে তোর পেছনে। জলের অশ্বারোহী রক্ষীটি বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে রাইফেলের বাঁট সজোরে নামিয়ে আনলো বয়েডের মাথায়। কিন্তু বয়েড অসামান্য ক্ষিপ্রতায় মাথা সরিয়ে নিলো। লোকটার কুজি ধরে একটানে জলে

নামিয়ে আনলো। জল তোলপাড় করে শুরু হলো ধস্তাধস্তি। কিন্তু লোকটা অসহায় হয়ে পড়লো বয়েডের পশু শক্তির কাছে, ভীষণভাবে জল তোলপাড় শুরু হলো।

একটু পরে বয়েড একা ভেসে উঠলো। তাড়াতাড়ি গিয়ে সাঁতরে যাওয়া ঘোড়াটাকে ধরে এমনভাবে তার আড়ালে ভেসে এগিয়ে চললো, যাতে ওপাড়ের প্রহরীটি গুলি করতে না পারে। মাঝে মাঝে তাড়াতাড়ি সাঁতরাবার জন্য ঘোড়াটাকে খোঁচা মারতে লাগলো। লোকটা বয়েডের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লো। কিন্তু পরমুহূর্তেই একলাফে ঘোড়ায় চাপলো। তীরের বেগে ঘোড়া সমেত নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে বয়েডকে অনুসরণ করলো।

ওদিকে বয়েড ঘোড়াটাকে নিয়ে ভীষণ অসুবিধায় পড়েছে মাঝে মাঝে খিস্তি দিয়ে ঘোড়াটাকে তাড়াতাড়ি যাবার জন্য ধাক্কা মারছে।

হঠাৎ বয়েড ঘোড়া ছেড়ে জলের মধ্যে ডুব দিলো। ও ডুব দেওয়া মাত্রই অনুসরণরত অশ্বারোহী প্রহরীটি সতর্ক হয়ে হাতে রাইফেল তুলে নিলো। চারিদিকে নজর রাখতে লাগলো। কোথায় বয়েড ভেসে ওঠে।

বয়েড ডুব সাঁতারে প্রহরীর দূরত্বটা ঠিক আন্দাজ করতে পারেনি। ভুলক্রমে ও লোকটার পাশেই ভেসে উঠলো। মাথা ঝাঁকিয়ে জল ঝেড়ে বিদ্যুৎগতিতে তাকে ধরতে গেলে কিন্তু লোকটা খুব সতর্ক ছিলো। উদ্যত রাইফেলের বাঁট দিয়ে সজোরে আঘাত করলো মাথায়। বয়েড চেষ্টা করেও সে আঘাত এড়াতে পারলো না। সোজা তলিয়ে গেলো। একে একে সেখানকার জল ফিকে লাল–লাল–গাঢ় লাল হয়ে উঠলো।

লোকটা ঘোড়া নিয়ে তাড়াতাড়ি পাড়ে এসে উঠলো। অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে বয়েডের ভেসে ওঠার অপেক্ষা করতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরেই বয়েডকে দেখা গেলো। ওর দেহটা উপুড় হয়ে ভাসছে–এগিয়ে চলেছে স্রোতের টানে। ভাসতে ভাসতে কিছুদূর গিয়ে দেহটা নদীর পাড়ে ঠেকে রইলো। ওদিকে অন্য প্রহরীর মৃতদেহটা ওপাড়ে ভেসে উঠেছে।

অপেক্ষমান রক্ষীটি চোখ বুলিয়ে মৃতদেহ দুটো দেখলো। তারপর ঘোড়ার পিঠে উঠে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো।

নলখাগড়ার বোপ ভেদ করে ঝড়ের বেগে ছুটে চললো। ছুটে চললো ফার্নওয়ার্থের দিকে। ঘোড়র ক্ষুরের শব্দ যতক্ষণ না মিলিয়ে যায় ততোক্ষণ অপেক্ষা করলাম। তারপর খুব সাবধানে লুকোনো জায়গা ছেড়ে বাইরে এলাম। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নদী পার হয়ে পালাতে হবে।

আমার পালানোর কথা জানার পর জেলার প্রতিটি পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াবে। রাষ্ট্রের প্রতিটি পুলিশ ফাঁড়িকে আমার চেহারার বিবরণ জানিয়ে সতর্ক করে দেওয়া হবে নাঃ, দেরী করলে হবে না। যেমন করেই হোক একটা নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছতে হবে।

প্যান্টের ভাঁজে ছাড়া যে অবশিষ্ট মরিচটুকু পুটলিতে ছিলো, সেটাকে ভালো করে বাঁধলাম। এর মধ্যেই সূর্য মাথার ওপর চলে এসেছে। রোদের অসহ্য উত্তাপ এখনই অনুভব করতে পারছি। আর দেরী না করে ছুটে চললাম। প্যান্টের ভাজ থেকে মরিচের

গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। যাক, কুকুরগুলোর জন্য আর চিন্তা নেই-অক্লান্তভাবে ছুটে চললাম।

নদীর পাড় ধরে ঘণ্টা দুই দৌড়বার পর ঠিক করলাম এবারেনদী পার হতে হবে। এখান থেকে রেললাইন প্রায় ষোলো মাইল দূরে। নদীর দিকে এগিয়ে গেলাম। মরিচের পুঁটলিটা ভাজ করলাম। প্যান্টের মধ্যে। তারপর কোমরের বেল্ট দিয়ে শক্ত করে বাঁধলাম। এবারে নদীর শীতল জলে গা ভাসালাম।

.

০৩.

বিকেল হয়ে গেছে। রোদের তাপ অনেকটা কমে এসেছে। একটা বিশাল গাছের ছায়ায় অবসন্ন দেহে শুয়ে আছি। সামনেই পাহাড় ঢালু হয়ে নেমে গেছে তার কোল ঘেঁষে বড় রাস্তা। একজন পুলিশ অফিসার ঝড়ের গতিতে মোটর বাইক চড়ে ছুটে চলেছে। তার পেছন পেছন একটা ওয়্যারলেস ভ্যান। খুব সম্ভব আমাকেই খুঁজছে।

রেললাইন এখনও পাঁচ মাইল দূরে। অপেক্ষা না করে দৌড়োলে হয়তো অনেক আগেই ওখানে পৌঁছে যেতাম, কিন্তু দিনের বেলায় এ জায়গাটা পার হওয়া উচিত হবেনা। চারিদিকে খাঁ খাঁ করছে। অদূরে একটা গোলাবাড়ি ছাড়া লুকোবার আর কোনো জায়গাই নেই। অগত্যা রাত পর্যন্ত অপেক্ষা না করলেই নয়।

এই গোলাবাড়িটা চারিদিকে বুকসমান উঁচু কাঠের বেড়ার মাঝখানে অবস্থিত। আর তার পাশেই টিনের চালা দেওয়া একটা গুমটিঘর। চারিদিকের বেড়ার এককোণে একটা কাঠের দরজা।

হঠাৎ চোখে পড়লো গোলাবাড়ি থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে আসছে। প্রথমে মেয়েটিকে ততটা গুরুত্ব দিই নি কিন্তু ওর হাতের দিকে নজর পড়তেই আমার জিভে জল এলো। অসম্ভব খিদে পেয়েছে। মেয়েটি তরমুজের ঝুড়িটা নিয়ে গুমটিঘরে ঢুকে পড়লো। একটু পরেই খালি হাতে বেরিয়ে এলো। আবার গোলাবাড়ির দিকে ফিরে চললো।

ঠিক করলাম অন্ধকারের মধ্যেই কয়েকটি তরমুজ শেষ করতে হবে। কারণ পেটে কিছু না পড়লে পথ চলা অসম্ভব।

ঘণ্টা দুই পরে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া নেমে এলো চারিদিকে। বড় রাস্তায় যানবাহন চলাচল ফিকে হয়ে এলো। গোলাবাড়ির ভেতর কতকগুলো ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। অন্ধকারে কারো নজরে পড়ার ভয় নেই দেখে নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে এগিয়ে চললাম। পাহাড়ী ঢালু জমি ধরে এক ছুটে গিয়ে পৌঁছলাম বড়রাস্তায়। এগিয়ে চললাম বাড়িটার দিকে। কাঠের বন্ধ দরজাটা টপকে ভেতরে নামলাম। ছুটে গিয়ে টিনের চালা দেওয়া গুমটি ঘরে আশ্রয় নিলাম। অন্ধকারেই নাকে এলো তরমুজের সুস্বাদু গন্ধ। খিদেটা যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে গেলাম, হাতে ঠেকলো তরমুজের স্তূপ। মনে হলো এরা তরমুজের চালানদার। একটা বড় দেখে তরমুজ তুলে নিয়ে দাঁত বসালাম। কয়েকটা

তরমুজ খাওয়ার পর পেটের খিদে কিছুটা শান্ত হলো। কিন্তু ক্লান্তিতে চোখের পাতা ভারী হয়ে এলো। হাতড়ে হাতড়ে গিয়ে তরমুজের জুপের পেছনে আশ্রয় নিলাম। শুয়ে পড়তেই ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে এলো।

হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই ভীষণভাবে চমকে উঠলাম। একলাফে উঠে দাঁড়ালাম। গুমটিঘরের খোলা দরজা দিয়ে চোখে পড়লো দূরের ধূসর পাহাড়। তার পেছন থেকে উঁকি মারছে ভোরের সূর্য। ভোরের বিবর্ণ আলো এসে ঠিকরে পড়েছে ঘরের ভিতরে।

একটা অজানা ভয় আমাকে আঁকড়ে ধরলো। এতোক্ষণ ধরে ঘুমিয়েছি কেউ আমাকে দেখে ফেলেনি তো?

আমার পরনে কয়েদীর ডোরাকাটা পোশাক। এই পোশাকে যদি দিনের বেলায় বের হই তবে নির্ঘাত ধরা পড়তে হবে। সুতরাং রাত পর্যন্ত অপেক্ষা না করে উপায় নেই। ঘণ্টাখানেক কোনো রকমে কাটাবার পর হঠাৎ আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন বলে উঠলো–ঘরে কেউ ঢুকেছে।

কানে এলোনড়াচড়ার শব্দ। সাবধানে মাথা তুলে উঁকি মারলাম। দেখি, আগের দিনের মেয়েটি তরমুজগুলোকে বেছে সরিয়ে রাখছে একধারে। ওর বয়স হবে সতেরো, গায়ের রঙ বাদামী। দেখতে খুব একটা সুন্দরী না হলেও কেমন যেন একটা আলগা আকর্ষণ আছে। হয়তো ওর উদ্দাম সপ্তদশী যৌবনই এর জন্য দায়ী। চটপট অভ্যস্ত হাতে মেয়েটি কাজ করে চলল। আমাকে ও দেখতে পায়নি। ঝুঁকে পড়ে বড় তরমুজগুলো ও আলাদা করে রাখছে।

মেয়েটিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগলাম। হঠাৎ বুঝতে পারলাম যে আমি মেয়েটির চোখে পড়ে গেছি। পলকের জন্য ওর হাত দুটো থেমে গেলো। মনে হলো ও ভয় পেয়ে গেছে। এখুনি কিছু করা দরকার। নয়তো বাইরে বেরিয়ে মেয়েটি যে চেঁচিয়ে লোক জড়ো করবে, তাতে আর সন্দেহ নেই। ওর মুখে কেমন একটা চাপা উত্তেজিত ভাব।

আড়াল থেকে বাইরে এসে বললাম, ভয় পেয়োনা।

বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে দাঁড়ালো মেয়েটি। ওর মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। আতঙ্কে ওর গলা দিয়ে স্বর বের হলো না–ভয়ার্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। আমার দিকে তাকিয়ে গোঁফ দাড়ির জঙ্গল দেখে মেয়েটা আরো ভয় পেয়েছে।

ভয় নেই, আমি তোমার কোনো ক্ষতি করবোনা।স্থির চোখে ওকে লক্ষ্য রেখে আশ্বাস দিলাম।

মেয়েটির পরনে একটা চাপা প্যান্ট, আর লাল সাদা চেক টানা শার্ট। ও দেওয়ালে হেলান দিয়ে উত্তেজনায় হাঁপাতে লাগলো। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ওর উন্নত স্তনদ্বয় একবার উঠছে, একবার নামছে।

খবরদার আমার কাছে এসো না। চাপা তীক্ষ্ণঝরে ও আর্তনাদ করে উঠলো।

আমি আশ্বাসের নরম সুরে ওকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, পুলিশ আমাকে খুঁজছে-আমি–ফার্নওয়ার্থ থেকে পালিয়ে এসেছি। তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে? আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে–তাছাড়া কিছু জামাকাপড় দরকার।

দেখলাম এতক্ষণে মেয়েটির ভয় অনেকটা কমে এসেছে। ও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জানতে চাইলো–আমি এখানে কেন এসেছি?

আমি জানালাম, দূর থেকে তরমুজগুলো দেখে খিদের জ্বালায় নিজেকে আর সামলাতে পারিনি। খাওয়াদাওয়ার পর ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম রাতের অন্ধকারে রেললাইন পর্যন্ত গিয়ে কোনো ট্রেনে উঠে পালাবো, কিন্তু পুলিশ রেললাইন পাহারা দিচ্ছে–

আমাকে বাধা দিয়ে মেয়েটি বলে উঠলো, গত রাতে রেডিওতে বলেছে; তুমি রেললাইনের দিকে যাবে বলেই পুলিশ সন্দেহ করছে। কিন্তু ফার্নওয়ার্থে যাবার মতো তুমি কি করেছিলে?

আমি মেয়েটিকে একে একে সব কথা খুলে বললাম, কিছুই গোপন করলাম না। অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ও সব কথা শুনতে লাগলো। ওর মুখে কেমন যেন করুণার ভাব ফুটে উঠলো। মমতায় ওর গভীর দুই চোখ ছলছল করে উঠলো।

সব বলতে পেরে মনটা যেন হালকা হলো।

ফার্নওয়ার্থে আমি কিছুতেই ফিরে যাবো না। তুমি যদি সাহায্য না করো, তাহলে আমার আর কোনো উপায় নেই। ওখানে ফিরে যাওয়ার চেয়ে আমি আত্মহত্যা করবো।

মেয়েটি অনেকক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে এলো। ফার্নওয়ার্থ সম্বন্ধে আমিও কাগজে পড়েছি। সব কথা শোনার পর তোমাকে ওখানে ফেরৎ পাঠাতে আমার বিবেকে বাধছে। আমি তোমাকে সাহায্য করবো।

মেয়েটি গুমটি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। মুহূর্তের জন্যে দ্বিধাগ্রস্ত মনে ভয় এসে উপস্থিত হলো, ওকে বিশ্বাস করা কি ঠিক হবে? কিন্তু এছাড়াও তো আর কোনো উপায় নেই। ও যদি পুলিশে খবর দেয় তবে সেটাকে দুর্ভাগ্য বলে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কি?

হঠাৎ দেখা গেলো মেয়েটি এগিয়ে আসছে, ডান হাতে ঝোলানো এক বালতি গরম জল, আর বাঁ-হাতে একটা তোয়ালে, সাবান, ক্ষুর আর কিছু জামা কাপড়। বালতিটা সামনে রেখে, জামাকাপড়গুলো ও আমার হাতে দিলো, হাত-পা ধুয়ে এগুলো পরে নাও। আমি খাবার নিয়ে আসছি।

মিনিট দশ পরে ও ফিরে এলো, ততক্ষণে আমার হাত-পা ঘোয়া, দাড়ি কামানো–সব হয়ে গেছে। কয়েদীর পোষাক ছেড়ে ওর দিয়ে যাওয়া পোষাকগুলো পরে ফেলেছি, লক্ষ্য করলাম ওর হাতে খাবারের ট্রে, তাতে মাংস, ডিম সেদ্ধ আর কফি, আমার কাছে সেটাই যথেষ্ট মনে হলো।

খাওয়াদাওয়ার শেষে মেয়েটি আমার দিকে এক প্যাকেট সিগারেট এগিয়ে দিলো। সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোয়া ছাড়লাম। নিজেকে বেশ সুস্থ-সতেজ মনে হলো।

মেয়েটি আমাকে বললো, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এই তরমুজগুলো নিয়ে যাবার জন্যে একটা ছেলে ট্রাক নিয়ে আসবে, রোজ এই একই সময়ে এখানে আসে। এখানেই খাওয়া-দাওয়া

সেরে আবার ট্রাক নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সোজা যায় ওকল্যান্ডের বাজারে। সেখানে ট্রাক রেখে টাকার তাগাদায় যায়-ও এসে যখন বাড়িতে খেতে ঢুকবেতখন তুমি গিয়ে ওর ট্রাকের পেছনে লুকিয়ে পড়বে। তারপর ওকল্যান্ডে পৌঁছে, চুপিসাড়ে নেমে পড়বে।

মেয়েটির কথায় রাজি হলাম। ওকে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে আমার চোখে জল এসে গেলো।

একটু পরে ট্রাক এসে পৌঁছলো। চালক একটি অল্পবয়সী ছেলে, সে ট্রাক রেখে ভেতরে যেতেই গাড়ির পেছনে উঠে পড়লাম।

তারপর এক সময় ট্রাক ছেড়ে দিলো, একটু পরে দেখলাম বিকেলের রোদ তখন ঝিমিয়ে এসেছে, দূরে দেখা যাচ্ছে সেই গোলাবাড়িটা, তার দরজায় মেয়েটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। পড়ন্ত রোদ্দুর ওর লাল সাদা ডোরা কাটা শার্টের গা থেকে ঠিকরে পড়ছে। মেয়েটি আস্তে আস্তে হাত তুলে আমাকে উদ্দেশ্য করে নাড়তে লাগলো। ট্রাক ক্রমশঃ এগিয়ে চললো– নিজের অজান্তেই গাল বেয়ে নেমে এলো অশ্রু।

এই সুন্দর স্মৃতিটুকু একান্ত আমার করেই সযত্নে তুলে রাখবো মনের মনিকোঠায়। অনিশ্চয়তায় ভরা জীবনের পথে এ স্মৃতিটুকুই হোক আমার একমাত্র সঙ্গী।

ফার্নওয়ার্থ থেকে পালাবার চারদিন পরে লিট্‌ল ক্রীকে এসে পৌঁছলাম। ওকল্যান্ড থেকে একটা মালগাড়ি ধরে প্রায় এক হাজার মাইল পার হয়ে, এসে উপস্থিত হয়েছি এই লিটু ক্রীকে।

মাথার ওপর দুপুরের চড়া রোদ। রাস্তাঘাট নির্জন। মাঝে মাঝে দু-একজন পথচারী চোখে পড়ছে।

মেয়েটি যে পাঁচ ডলার দিয়েছিলো তা থেকে অবশিষ্ট মাত্র এক ডলার। ওকল্যান্ড থেকে ট্রেনে করে এখানে আসবার পথে কিছুই পেটে পড়েনি। অদূরেই একটা স্ন্যাকবার দেখতে পেলাম। এগিয়ে গেলাম। দোকানে ঢুকে স্যান্ডউইচ আর কফি আনতে বললাম। ভাবতে লাগলাম, এরপর কোথায় যাবো।ট্রপিকা স্প্রিংসের দূরত্ব এখান থেকে প্রায় দুশ মাইল। সেখানে পৌঁছবার একমাত্র উপায় কোনো চলতি গাড়ি বা ট্রাকে আশ্রয় নেওয়া। একটি লোককে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে একটা পেট্রোল পাম্প আছে–তার নাম পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন। এর পরের পেট্রোল পাম্পটা একেবারে পাহাড়ের ওপারে–একশো ষাট মাইল দূরে সেই কারণে এর মালিক কার্ল জেনসন নাম দিয়েছে পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন–অর্থাৎ শেষ সীমান্ত। তাছাড়া এর সঙ্গে লাগোয়া একটা রেস্তোরাঁও আছে–জেনসনই তার মালিক।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দোকানের খোলা দরজায় আবির্ভূত হলো এক বিশাল চেহারার পুরুষ। সে কাউন্টারের দিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলো। মাইক আমার দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করলো, অর্থাৎ এই কার্ল জেনসন।

জেনসন লম্বায় প্রায় সাড়ে ছ ফুট, গায়ের রঙ তামাটে, বয়স প্রায় পঞ্চান্নর কাছাকাছি হবে। মাইক কফির কাপ এগিয়ে দিলো জেনসনের দিকে, মিঃ জেনসন, এই লোকটি পাহাড় পেরিয়ে ট্রপিকা স্প্রিংসে যেতে চায়। আমি বলেছি, আপনার ওখানে যেতে,- সেখানে যদি কোনো ট্রাক ধরতে পারে; এখানে ত আর কোনো গাড়ি থামবে না।

জেনসন আমার দিকে ফিরে হাসলো, মাইক ঠিকই বলেছে ও ছাড়া তোমার উপায় নেই। তুমি ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে যেতে পারো, কিন্তু ঐ পর্যন্তই!

আমি বললাম কিন্তু আপনার কোনো অসুবিধা হবে না তো?

জেনসন অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো, পাগল নাকি। এতোখানি রাস্তায় যে একজন সঙ্গী পাবো, সেটাই অনেকখানি। হঠাৎ কি মনে করে জেনসন তার পেশীবহুল হাত আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলল, আমার নাম কার্ল জেনসন।

জেনসনের হাতে হাত মেলালাম, আমি জ্যাক প্যাটমোর।

প্রথমেই যে নামটা মনে এলো সেটাই বলে ফেললাম।

মাইককে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম। বাইরে একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে ছিলো। জেনসন এগিয়ে গিয়ে তার চালকের আসনে বসলো।

ট্রাকের ভেতরটা অসহ্য গরম। আমরা দুজনেই গায়ের কোট খুলে ফেললাম। জেনসন সিগারেট বের করে ধরালো। আমার দিকেও একটা এগিয়ে দিলো। তারপর স্টার্ট দিয়ে ট্রাক ছেড়ে দিলো।

শহরের বাইরে পৌঁছতেই চোখে পড়লো দিগন্ত প্রসারী মরুভূমি। চারিদিকে শুধু বালি আর বালি, মাঝের সরু পিচঢালা রাস্তা ধরে জেনসন ট্রাক ছুটিয়ে চলেছে। বহুদূরে চোখে

পড়ছে। পাহাড়–তার ওপারেই ট্রপিকা স্প্রিংস। মাথার ওপরে সূর্য কিছুটা ঢলে পড়লেও গরম কমেনি।

স্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে জেনসন আমার দিকে আড়চোখে তাকালো। তারপর জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কোথা থেকে আসছ? তুমি কোথায় কাজ করো?

আমি বললাম, আমি ওকল্যান্ড থেকে আসছি। আমাদের তালার ব্যবসা আছে। আমার বাবাও এই ব্যবসা করতেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে একসময় জেনসন প্রশ্ন করলো, আচ্ছা জ্যাক তুমি গাড়ির ইঞ্জিন টিঞ্জিনের ব্যাপার বোঝা?

খুব সামান্য–দু-একবার কয়েকটা গাড়ির কাজ করেছি।

জেনসন তার নীল চোখের দৃষ্টি স্থিরভাবে মেলে ধরলো আমার দিকে, জানতে চাইলো, তুমি কি ট্রপিকা স্প্রিংসে থাকবে বলে ঠিক করেছে?

হা– জানলা দিয়ে বাইরে তাকালাম। আকাশে চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েকটা চিল।

ওখানে কোনো চাকরি নিয়ে যাচ্ছো নাকি?

এবার আমার মুখে বিরক্তির ভাব ফুটে উঠলো। সেটা লক্ষ্য করে জেনসন একটু বিব্রত হলো, মানে–যদি কোনো চাকরির ব্যাপার হয়, তবে আমিই তোমাকে একটা চাকরি দিতে পারি।

অবাক হয়ে আমি জেনসনের দিকে তাকালাম, আপনি আমায় চাকরি দেবেন?-কি চাকরি?

জেনসন বললো, লোহালক্কড় সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, গাড়ির কাজও জানে এমন একজন লোকই আমার প্রয়োজন। আমি আর আমার স্ত্রী লোলা সব কাজ সামলাতে পারি না। তোমার মতো একজন লোকই আমি খুঁজছি, তবে সপ্তাহে তিন চারদিন কিন্তু রাত্তিরে কাজ করতে হবে–অবশ্য দিনে বিশ্রাম পাবে। আমার স্ত্রী চমৎকার রান্না করে, সে তুমি খেলেই বুঝতে পারবে।

ভেবে দেখলাম গা-ঢাকা দেবার মতো এমন একটা সুযোগ ছাড়ি কেন। এই মরুভূমির দেশে পুলিশ আমার খোঁজও পাবে না।

আমি জেনসনের চোখে চোখ রেখে উত্তর দিলাম যে আমি রাজি। জেনসন প্রচণ্ড খুশী হলো। অদ্ভুত ভাবে অদ্ভুত নামের এক পেট্রোল পাম্পে চাকরি পেয়ে গেলাম।

.

০৪.

সামনের একটা উঁচু ঢিবি পার হতেই চোখে পড়লো পাহাড়ী ঢালু রাস্তা। যে দিকে তাকাই শুধু বালি আর বালি। বিকেলের চড়া রোদ বালির সমুদ্রকে করে তুলেছে উজ্জ্বল,

তার গা থেকে ঠিকরে আসা সোনালী আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। দূরে বহুদূরে চোখে পড়লো একটা অস্পষ্ট বিন্দু-জেনসন আঙুল তুলে দেখালো, ওটাই আমার পেট্রোল পাম্প

পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন।

-ঘরগুলোকে এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। রাস্তার বাঁ দিকে একটা ছোট্ট বাংলো। বাংলোর উল্টোদিকে রয়েছে একটা ঘর। রাস্তা একে একে মিলিয়ে গেছে পাহাড়ের ওপিঠে

সবকটা ঘরের রঙই আকাশ নীল। জেনসন বললো, ঐ ডানদিকের ঘরটা তোমার। আর এ দিকের বাংলোটায় আমি আর লোলা থাকি।জায়গাটা এমনি নির্জন আর বিরক্তিকর, শুধু লোলা আছে বলেই সবকিছু ভুলে থাকতে পারি। এখন তুমি এসেছো–আমাদের কাজের অনেক সুবিধা হবে।

আমরা পেট্রোল পাম্পে পৌঁছে গেছি। অদূরে চোখে পড়ছে বাংলো। বাংলোর সামনে একটা বারান্দা, তার থেকে তিন ধাপ সিঁড়ি নেমে গেছে। একটা মেঠো পথ এগিয়ে এসেছে রাস্তা পর্যন্ত।

জায়গাটা এতো সুন্দর হতে পারে আমার ধারণা ছিল না।

গাড়ির দরজা খুলে জেনসন নেমে পড়লো, পিছন পিছন আমিও নামলাম। জেনসন আমার ঘরটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললো, জ্যাক তুমি আর দেরী করো না। হাত মুখ ধুয়ে নাও। আমি এদিকে তোমার খাবার ব্যবস্থা করছি। তারপর সে বালিতে ঢাকা মেঠো পথ ধরে বাংলোর দিকে এগিয়ে চললো।

আমিও ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। দরজা খুলতেই বসবার ঘর, বেশ সুন্দর ভাবে সাজানো। ঘরের এককোণায় একটা টেলিভিশন সেটও রয়েছে। বসবার ঘর পার হলেই একটা ছোট্ট শোবার ঘর।

শোবার ঘরে জামাকাপড় ছেড়ে বাথরুমে গেলাম, হাত মুখ ধুয়ে দাড়ি কামাতে শুরু করলাম। দাড়ি কামানো হয়ে গেলে আয়নায় নিজের চেহারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। মনে মনে ভাবলাম খবরের কাগজে যদি আমার ছবি ছাপা হয়ে থাকে তবুও কারও পক্ষে আমাকে চেনা সম্ভব নয়।

জামাকাপড় পরে বেশ উৎফুল্ল চিত্তে বাইরে বেরিয়ে এলাম। কিছুক্ষণ জেনসনের বাংলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম। সামনে আর পেছনে তাকালে বালি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।

মনে মনে আশ্বস্ত হলাম। পুলিশ হয়তো ওকল্যান্ডে বা অন্য কোনো শহরে আমার খোঁজ করবে, কিন্তু এই মরুভূমিতে নিশ্চয়ই খোঁজ করার কোনো চেষ্টাই করবে না। ঠিক করলাম যতদিন পারা যায় এখানেই থাকবো।

রাস্তা পার হয়ে রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকলাম। ঘরের একপাশে সাজানো পাঁচটা টেবিল আর কতকগুলি চেয়ার। এছাড়া কাউন্টারের সামনে গোটা দশেক টুল। কাউন্টারের ওপর সাজানো সারি সারি বীয়ার ও সোডার বোতল। এক পাশে গোটা দুয়েক আচারের শিশি। তার সঙ্গে রয়েছে একগাদা কাঁচের গ্লাস, ছুরি, কাঁটা চামচ আর কাগজের রুমাল। প্রত্যেকটি জিনিষই পরিষ্কার ঝকঝক করছে। দেওয়ালের গায়ে টাঙানো একটা ফলকে

ছাপা হরফে লেখা রয়েছে খাদ্যের তালিকা। কাউন্টারের পেছনে আধ ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে রান্নার সুস্বাদু গন্ধ ভেসে আসছে। ভাবছি কাউকে ডাকবো কিনা। হঠাৎ কানে এলো জেনসনের গলা, এই লোলা-শোনো, অবুঝ হয়োনা, অনেক ভেবেচিন্তে আমি জ্যাককে এখানে নিয়ে এসেছি, ও এখানে কাজ দেখাশোনা করলে, আমরা সপ্তাহে দু-চার দিন করে ওয়েন্ট ওয়ার্থে বেড়াতে যেতে পারবো।

দ্যাখো কার্ল, একটা কথা তোমাকে হাজারবার বলেছি, আজও বলছিঃ কোনো উটকো লোককে আমি এখানে রাখবো না, ব্যস।

হ্যাঁ, জানি তুমি বলেছো, কিন্তু এটা বুঝতে পারছে না, একজন লোক রাখা আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন। ভেবে দ্যাখো তো, গতকাল রাত্রে তোমাকে কতবার উঠতে হয়েছে? বারে বারে তোমাকে উঠে এসে ঐ হতচ্ছাড়া ট্রাকগুলোকে পেট্রল দিতে হয়েছে। আমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন লোলা,জ্যাক যদি রাত্রিবেলা কাজ করে, তবে আমরা একটু নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারি। তাছাড়া দু-চারদিন দেখতে ক্ষতি কি? তারপর যদি পছন্দ না হয়, তখন জ্যাককে বারণ করে দিলেই হবে।

তুমি কি করে জানলে লোকটা বিশ্বাসী? ওকে এখানে রেখে আমরা ওয়েন্ট ওয়ার্থে যাবো, আর ও হাত গুটিয়ে বসে থাকবে মনে করেছো?সিন্দুক ভেঙে টাকা হাতিয়ে সোজা কেটে পড়বে।

লোলার মনোভাবে অস্বস্তি বোধ করলাম। সে যাই হোক পরে ভেবে দেখা যাবে। কিন্তু আপাততঃ সাড়া দেওয়া দরকার। কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেলাম, দরজায় শব্দ করে

ডাকলাম কেউ আছেন নাকি? রান্নাঘরের ভেতর থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বর সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেলো।

একটু পরে দরজা খুলে জেনসন বেরিয়ে এলো, মুখে কেমন একটা অপ্রতিভ হাসি, এসো জ্যাক ঘর কেমন লাগলো? পছন্দ হয়েছে তো?

আমার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন চেহারা দেখে জেনসন আশ্বস্ত হয়েছে মনে হলো। আমি মুখে হাসি ফুটিয়ে বললাম, পছন্দ হয়নি মানে? সত্যি মিঃ জেনসন আপনার পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন-এর তুলনা নেই। জেনসন সম্মতি জানালো।

তারপর সে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেলো আমার খাবার ব্যবস্থা করতে।

কিন্তু জেনসন রান্নাঘরে পা বাড়াতেই কানে এলো বাইরে থেকে ভেসে আসা কোনো গাড়ির হর্নের শব্দ।

ঘরের জানলা দিয়ে দেখা গেলো বাইরের রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে একটা জীর্ণ ধূলি মলিন প্যাকার্ড। চালকের নির্দেশে জেনসন গাড়িটার ট্যাঙ্কে পেট্রল ঢালতে লাগলো।

হঠাৎ পেছনে সামান্য শব্দ হতেই চমকে ফিরে দাঁড়ালাম। রান্নাঘরের খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে। ওর চোখের দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছে সীমাহীন কৌতূহল। মেয়েটির মাথা ভর্তি একরাশ লাল চুল, কামনা মদির পুরু ঠোঁট, তিরিশ বসন্তের শরীরে ভরন্ত যৌবন। তার পান্না সবুজ টলটলে চোখ রক্তে নেশা ধরায়, মেয়েটিকে দেখার পর কোনো

পুরুষের পক্ষেই ওর যৌবনের হাতছানিকে উপেক্ষা করা অসম্ভব। ওর পরনে একটা সাদা গাউন ও শরীরের সঙ্গে যেন ভেজা কাপড় হয়ে লেপটে আছে।

মেয়েটি আমার দিকে এগিয়ে এলো। লক্ষ্য করলাম ওর গাউনের নীচে কোনো অন্তর্বাসের বালাই নেই।

অপলক দৃষ্টিতে দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কারো মুখে কোনো কথা নেই।

কতক্ষণ এভাবে কেটেছে জানিনা। একসময় খেয়াল হলো জেনসন আমার পাশে দাঁড়িয়ে, এই যে লোলা, তুমি এসেছো, আলাপকরিয়ে দিই–এই জ্যাক।জ্যাক এ হচ্ছে লোলা–আমার স্ত্রী।

মেয়েটি ছোট্ট করে ঘাড় নাড়লো, গভীর সবুজ চোখে শুধু ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই নেই।

জেনসন বললো, আর দেরী করো না লোলা, কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করো।

ভাবলেশহীন মুখে লোলা জবাব দিলো, অপেক্ষা করো, আমি আসছি। ও ফিরে চললো, চলার সময় স্পষ্ট হয়ে উঠলো ওর ভারী নিতম্বের সুডৌল রেখা। নিটোল ছন্দে হিল্লোল তুলে ও এগিয়ে চললো রান্নাঘরের দিকে।

আমার সারা মুখ তখন ঘেমে উঠেছে। একটা কাগজের রুমাল টেনে নিয়ে মুখ মুছলাম। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে,–চোখের সামনে ভাসছে লোলার পাগল করা যৌবন।

খাওয়া দাওয়া সেরে আমি আর জেনসন বাইরে এলাম। আমাকে কোন্ কোন্ দিন কাজ করতে হবে সেটা তার কাছ থেকে জেনে নিয়েছি। সপ্তাহে তিনদিন আমাকে রাতে কাজ করতে হবে। গাড়ি ব্রেকডাউনের ব্যাপার হলে আমাকেই সামলাতে হবে। আর গ্যারেজ আর পাম্পের কাছটা সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে।

বাইরে এসে জেনসন আমাকে দেখিয়ে দিলো কিভাবে পাম্প থেকে পেট্রোল দিতে হয়। মোবিল আর পেট্রোলের দাম কিভাবে হিসাব করতে হয়, তাও বুঝিয়ে দিলো। তারপর লোহা বোঝাই ট্রাকটা খালি করার জন্য আমাকে ডাকলো।

এর মধ্যেই সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। দিনের অসহ্য গরম আর নেই। মরুভূমির ঠাণ্ডা হাওয়ায় ভেসে আসছে অসংখ্য বালুকণা। গোধূলির আলোয় দূরের ধূসর পাহাড় হয়ে উঠেছে রক্তাভ। মনে হয় যেন একটা শান্ত সমাহিত ভাব নেমে এসেছে দিনের উত্তপ্ত মরুভূমিতে।

আমি আর জেনসন মিলে লোহালক্কড়গুলো একে একে নামাতে আরম্ভ করলাম। কাজ করতে করতে হঠাৎই জেনসন আমার দিকে তাকালো, লোলার ব্যবহারে কিছু মনে কোরো না জ্যাক,-ও ওইরকমই। কেউ এখানে কাজ করুক, তা ও চায় না কে জানে কেন? হয়তো সব মেয়েরাই এরকম জেনসনের মুখে চিন্তার ছায়া।

কথা বলতে বলতে একটা পুরোনো মরচে পড়া গাড়ির ইঞ্জিন ও এক হ্যাঁচকায় মাটিতে নামালো। ওর শক্তি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। অতো ভারী ইঞ্জিনটাকে এমনভাবে বয়ে নিয়ে চললো, যেন পালকের তৈরী খেলনা। গুমটি ঘরে সেটা রেখে সে ফিরে এলো।

তারপর পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিলো। আমাকে বললো–প্রথম প্রথম লোলা হয়ছে তোমাকে ভালো চোখে দেখবে না কিন্তু দেখো কয়েকদিন পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। জেনসন আমাকে বলতে শুরু করলো যে, কিভাবে লোলার সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। সে হেসে বললো, ভাবতে অবাক লাগে-ভীষণ মজার ব্যাপার বুঝলে জ্যাক। আজ থেকে বছর দুয়েক আগের কথা। আমার প্রথমা স্ত্রী মারা যাওয়ায়, তখন একাই সব সামলাচ্ছি। মনের অবস্থা খুবই খারাপ। থেকে থেকেই বউয়ের কথা মনে পড়ছে। সমস্ত পরিবেশ যেন আমার মতই বিষয়–নিঃসঙ্গ। চুপচাপ বসে আছি, এমন সময় একটা বাস এসে দাঁড়ালো সামনের রাস্তায়। যাত্রীরা সব একে একে নেমে এলো, প্রায় তিরিশ-পঁয়ত্রিশ জন হবে। তার মধ্যে ভোলাও ছিল।

আমি রেস্তোরাঁর কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়েছিলাম যাত্রীরা সব হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো। একবার রানাঘর আর একবার খাওয়ার টেবিল–এই করে একেবারে হিমসিম খেয়ে যাবার অবস্থা হঠাৎ দেখি, সবুজ পোশাকে সজ্জিতা একটি সুন্দরী তরুণী আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। অভ্যস্ত হাতে যাত্রীদের দিকে খাবার এগিয়ে দিচ্ছে।

যখন বাস ছাড়ার সময় হলো ততক্ষণে সবাইয়ের খাওয়া হয়ে গেছে। মেয়েটি সাহায্য না করতে, কি যে করতাম তাই ভাবি! বাস ছাড়ার সময় ওকে জিজ্ঞেস করলাম, ও আমার এখানে চাকরি করবে কিনা, মেয়েটি তো এক কথায় রাজি।বাস ছেড়ে দিলো কিন্তু ও থেকে গেলো।

তারপর থেকে দুজনে মিলে কাজ করি। বেশ ভালোভাবেই দিন কেটে যায়। কিন্তু আমাদের একসাথে থাকা নিয়ে লোকে নানা কথা বলে, তাই কিছুদিনের মধ্যেই আমরা

বিয়ে করে ফেলি। লোলা আমার থেকে যদিও তেইশ বছরের ছোট। এমনিতে মাঝে মাঝে মান-অভিমান করে বটে কিন্তু খুব কাজের মেয়ে। এখন হয়তো কদিন একটু অভিমান করে থাকবে, কিন্তু পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

এমন সময় একরাশ ধুলো উড়িয়ে একটা ক্যাডিলাক এসে দাঁড়ালো। জেনসন আমাকে ওটা দেখতে বলে রেস্তোরাঁয় ফিরে গেলো। পেট্রল দিতে দিতে গাড়ির আরোহীদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করলাম। কথায় কথায় জানিয়ে দিলাম এখানে রেস্তোরাঁও আছে। ইচ্ছে করলে তারা খেয়ে নিতে পারেন। কারণ এরপর ট্রপিকা স্প্রিংস পর্যন্ত রাস্তায় কোনো দোকান নেই। আমার কথায় রাজি হয়ে ওরা গাড়ি থেকে নেমে রেস্তোরাঁর দিকে এগিয়ে চললো–এইভাবে আরম্ভ হলো আমার প্রথম কর্মব্যস্ত সন্ধ্যা। গাড়ির পর গাড়ি আসতে লাগলো কাজ করে চললাম। একসময় জেনসন আমার কাজের প্রশংসা না করে থাকতে পারলো না।

এক নাগাড়ে আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার পর যখন কোনো গাড়ির হেডলাইট চোখে পড়লো না, তখন ফিরে চললাম খাবার ঘরে।

গিয়ে দেখি, দুজন ট্রাকচালক কাউন্টারের সামনে টুলে বসে। তাদের সামনে প্লেটে ফ্রট পাই। রান্নাঘরের ভেতর থেকে বাসনপত্র নাড়াচাড়ার শব্দ পেলাম। বুঝতে পারলাম লোলা রান্নাঘরে।

জেনসন আমার দিকে তাকিয়ে বললো, জ্যাক তুমি আর দেরী করো নাআজ রাতে আমার পালা, কাল থেকে রাত্রিতে তোমাকে কাজ করতে হবে।

আমি আর দেরী না করে রাস্তা পার হয়ে এগিয়ে চললাম ঘরের দিকে। তারপর ঘরে গিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়লেও চোখে ঘুম নেই, অজস্র চিন্তায় মন ভারাক্রান্ত। মাঝে মাঝে চোখের সামনে ভেসে উঠছে লোলার ছবিও যেন হেঁটে চলেছে রান্নাঘরের দিকে–পরনে সেই সাদা গাউন– আমি বুঝতে পারছি লোলা পরস্ত্রী ওর কথা এভাবে আমার ভাবা উচিতনয়, কিন্তু তবুও ওর চিন্তা আমার মনকে আচ্ছন্ন করে রাখলো।

ঘরের জানলার ঠিক পাশেই আমার শোবার খাট, অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা বাংলোটাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। নির্নিমেষে তাকিয়ে রইলাম বাংলোর দিকে কিছুতেই ঘুম আসছে না।

প্রায় ঘণ্টাখানেক এভাবে শুয়ে থাকার পর একসময় বাংলোর একটা ঘরে আলো জ্বলে উঠলো। জানলার নীল পর্দা সরানো থাকায় আলোকিত ঘরটা পরিষ্কার চোখে পড়ছে, ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোলা। ওর হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। একটু পরে আয়নার সামনে বসে চুল আঁচড়াতে লাগলো। ওর একরাশি লাল চুল কোমরের কাছে আছড়ে পড়েছে।

আমি উত্তেজনায় উঠে বসে থাকলাম। অনুভব করলাম হৃদয় তোলপাড় করা মনের অবস্থা।

একটু পরে লোলা জানলার কাছে এসে গাউনের বোম খুলতে শুরু করলো..সাদা গাউনটা মেঝেতে খসে পড়লো। ও হাত বাড়িয়ে জানলা বন্ধ করে দিল। ঘষা কাঁচের পাল্লায় ভাসতে লাগলো ওর নগ্ন শরীরের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি।

অন্ধকারে কতক্ষণ এভাবে বসেছিলাম জানিনা, একসময় খেয়াল হলো বাংলোর আলো নিভে গেছে।

অপেক্ষা না করে শুয়ে পড়লাম কিন্তু সে রাত্রে আমার চোখে আর ঘুম এলো না।

ঘুম ভাঙাতে খাবার ঘরে

০৫.

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙাতে খাবার ঘরে এসে ঢুকলাম। তখন ঘড়িতে সাতটা বাজে। দেখি, লোলা একটুকরো কাপড় নিয়ে কাউন্টারের ওপরটা ঘষে ঘষে পরিষ্কার করছে। ওর পরনে খুব ছোটো একটা লাল প্যান্ট। গায়ে হলদে চোলি। এই পোশাকে লোলা আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এই স্বল্প পোশাকের বিরুদ্ধে যেন বিদ্রোহ করছে ওর উদ্ধত যৌবন। মনে মনে জেনসনকে হিংসা করলাম।

লোলা প্রথমে আমাকে দেখতে পায়নি। হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়ায় লক্ষ্য করলাম মুখে বিরক্তির ভাব। কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে পড়ে ও সামনের দিকটা ঘষতে লাগলো। ঝুঁকে পড়ায় চোখে পড়লো ওর সুগঠিত দুই স্তন–অন্তর্বাসের অনুপস্থিতি

রান্নাঘরের টেবিলের কাছে জেনসন বসেছিলো। টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত নোট আর খুচরা পয়সা। একপাশে একটা খালি প্লেট, ছুরি, কাটা চামচ, আর এক কাপ কফি। আমাকে দেখে সে হাসলো, এসো জ্যাক, ভেতরে এসো। কি খাবে বল? স্যান্ডউইচ, ডিম?

না, মিঃ জেনসন, শুধু এক কাপ কফি।

জেনসন আমাকে বললো, এদিকের সব কাজ সারা হয়ে গেলে, আমি আর লোলা ওয়েন্ট ওয়ার্থে যাবো; কিছু জিনিসপত্র কেনার আছে। গতকাল যা বিক্রি হয়েছে, গত কবছরে

কোনও দিন তার অর্ধেকও বিক্রি হয়নি। জ্যাক, এবারে ঠিক করেছি রেস্তোরাঁর বিক্রির ওপর তোমাকে পাঁচ পার্সেন্ট কমিশন দেবো। ওয়েন্ট ওয়ার্থ থেকে ফেরার সময় একটা অ্যাপ্রন নিয়ে আসবোতোমার কাজ করতে অনেক সুবিধা হবে।

কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, পোশাক ইত্যাদি কেনার জন্য আমার হাতে একশো ডলার খুঁজে দিলো জেনসন।

আমি জেনসনকে ধন্যবাদ জানালাম। জেনসন বললো, আরে ধন্যবাদ জানাবার কি আছে। এ তো তোমার পাওনা টাকা থেকেই দিলাম। রেস্তোরাঁর কমিশন হিসাবে আগাম দিলাম।

জেনসন চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো, জ্যাক কাল যে পুরোনো ইঞ্জিনটা দেখলে ওটা ওজন দরেই কিনে এনেছি; কিন্তু এখন ভাবছি, ইঞ্জিনটার পেছনে খাটলে হয়তো ওটাকে চালু করা যাবে। যাই হোক ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমি আর লোলা বেরিয়ে পড়ছি, তুমি কি একা থাকতে পারবে?

কেন পারবো না? আমার একা থাকতে কোনো অসুবিধা হবে না।

কফির কাপটা ধুয়ে রাখলাম, একটা সিগারেট ধরিয়ে খাবার ঘরে গেলাম।

লোলা পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ফ্রুট পাই এর জারে লেবেল লাগিয়ে রাখছিলো,আমি যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। শরীরের রক্ত চলাচল দ্রুত হয়ে উঠলো, যেন পরিষ্কার দেখতে

পাচ্ছি গত রাত্রে জানলায় দাঁড়িয়ে থাকা লোলাকে। লোলা আমার উপস্থিতি টের পেয়েও ফিরে তাকালো না। আমি আর অপেক্ষা না করে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

সকালের হালকা রোদে বেশ ভালোই লাগছে। রাতের ঠাণ্ডা আমেজটা যেন যেতে গিয়েও যায়নি। একটা ঝাটা নিয়ে পাম্পের কাছটা ঝাট দিতে শুরু করলাম। তারপর ঝাট দেওয়া শেষ করে গুমটি ঘরে গেলাম। সেখানে ইঞ্জিনটা নিয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পরে জেনসন আমার পাশে এসে দাঁড়ালো।

আমরা বেরোচ্ছি,জ্যাক, তোমার কোনো অসুবিধা হবে না তো?

না, না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি ঠিক পারবো।

জেনসনের পিছন পিছন গুমটি ঘরের দরজা পর্যন্ত এলাম। দেখি, বাংলো থেকে লোলা বেরিয়ে আসছে। পরনে একটা সবুজ রঙের আঁটোসাঁটো সুতী পোশাক।

জেনসন আমার কোমরে এক খোঁচা মারলো, কি হে, একেবারে বোবা হয়ে গেলে যে! দেখেছো কি রকম সেজেছে আমার বউ?

বোকার মত হেসে বললাম আপনার স্ত্রী সত্যিই সুন্দরী মিঃ জেনসন।

সবাই তো তাই বলে! জেনসনের মুখে গর্বের হাসি, যাকগে, চলি আবার দুপুরে দেখা হবে। ওদের গাড়ি একরাশ ধুলো উড়িয়ে বেরিয়ে গেলো

একটা সিগারেট ধরিয়ে চারপাশে তাকালাম : দেখতে লাগলাম পয়েন্ট অফ নো রিটার্নকে। সত্যিই এরকম একটা জায়গা যদি আমার থাকতো। আর থাকতে লোলার মত সুন্দরী স্ত্রী।

নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। আবার ইঞ্জিনটার কাছে ফিরে গেলাম। কিন্তু কিছুতেই স্থির হয়ে কাজ করতে পারছি না।–লোলার চিন্তাকে মন থেকে মুছে ফেলা অসম্ভব। গত রাতের কথা বারে বারে মনে পড়ছে

এইভাবে ঘণ্টাখানেক কেটে গেলো। একসময় দেখি, একটা শেভ্রলে গাড়ি গুমটি ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। তার আরোহী গাড়ি থেকে নামলো। বয়স হবে বছর চল্লিশের মতো। লম্বা, রোগা চেহারা, পরনে রঙ ওঠা একটা নীল প্যান্ট, ময়লা কালো জামা। গলায় একটা লাল রুমাল বাঁধা মাথায় বাদামী রঙের টুপি।

আগন্তুক এসে গুমটি ঘরে ঢুকলো। কাছ থেকে আরো খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। তাকে দেখেই আমি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। মনে হলো লোকটার চেহারায় কেমন যেন একটা পুলিশ পুলিশ ভাব, বিশেষ করে ঐ অন্তর্ভেদী সন্দেহ ভরা শিকারী চোখ জোড়ায়। আমরা উভয়ে উভয়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মনে হলো আমার ভিতরটা যেন তন্নতন্ন করে দেখছে। আমি ইঞ্জিনটা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম, কি চাই?

লোকটা প্যান্টের পকেটে দুহাত ঢুকিয়ে ঘাড় কাত করে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, চাই তো অনেক কিছুই। যেমন ধরো জানতে চাই তোমার পরিচয়; এখানে তুমি কি করছো,হয়তো জানতে চাই মিঃ জেনসন এখন কোথায় আছেন, হয়তো তোমার মুখ

থেকেই শুনতে চাই, নিজের চরকায় তেল দিন উপদেশটা-কি বলল?-লোকটা খিকখিক করে হেসে উঠলো।

লোকটার কথা শুনে আমার সারা শরীর রাগে জ্বলে উঠলো, কিন্তু মনে হলো লোকটার পরিচয় না নিয়ে লোকটার ওপর রাগ করাটা ঠিক হবে না।

ঠাণ্ডা স্বরেই জবাব দিলাম, মিঃ জেনসন ও মিসেস জেনসন ওয়েন্টওয়ার্থে গেছে। আর আমি হলাম জ্যাক প্যাটমোর এখানে নতুন চাকরিতে ঢুকেছি।

তাই নাকি! তার মানে কার্ল তোমাকে চাকরি দিয়েছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

হু–ভারী আশ্চর্যের ব্যাপার!

আমি তো ভাবতেই পারিনি ওর স্ত্রীর অমতে কার্ল এখানে লোক রাখবে। কথা বলার সময় তার সন্দেহভরা চোখ আমার ময়লা পোশাক, ছেঁড়া জুতো, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। একসময় নিজের মনেই মাথা নাড়লল, কি যেন ভাবলো, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, আমি কার্লের শ্যালক, আমার নাম রিক্সজর্জ রিক্স।

আমি অনুমান করলাম এ নিশ্চয় জেনসনের মৃত স্ত্রীর ভাই, লোলার কেউ নয়। সুতরাং বাজে কথায় সময় নষ্ট করে লাভ নেই ভেবে ইঞ্জিনটার দিকে মনোযোগ দিলাম। হঠাৎ

ঘাড়ের ওপর তার উত্তপ্ত নিঃশ্বাস অনুভব করলাম। গীয়ার বক্সের ওপর থমকে দাঁড়ালো আমার কর্মব্যস্ত হাত।

এসব পুরোনো মাল কেনাবেচার ব্যাপারে কার্লের বুদ্ধি আছে। কিন্তু মানুষ চিনতে ওর সময় লাগে, সেরকম বুদ্ধি ওর নেই।

চমকে উঠলাম। কি ইঙ্গিত করছে রিক্স?

কার্লের বউকে তোমার কেমন লাগে? ইঞ্জিনটার ওপর ঝুঁকে থাকায় সে আমার মুখের পরিবর্তন দেখতে পেলো না। কারণ রিক্স কিভাবে জানবে যে, সব সময় আমি শুধু লোলার কথাই ভাবছি।

ভালই, স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে ক্ল্যাচ-প্লেট খুলতে শুরু করলাম।

ভালো? তোমার তাই মনে হয়? কিন্তু জেনে রেখো চাঁদ, লোলা তোমাকে পছন্দ তো করেই না, এখানে কেউ কাজ করুক তাও সে চায় না আমাকেই বলে তাড়াতে পারলে বাঁচে। ঐ ধরনের একটা উটকো মেয়েকে বিয়ে করে বসবে তা ভাবতেই পারিনি। কিন্তু লোলা খুব চালাক মেয়ে। কালের মতো পয়সাওয়ালা লোককে ও হাতছাড়া করতে চায়নি। তাই ওর সামনে যৌবনের মায়াজাল বিছিয়ে টোপ ফেলেছে। যাই হোক তুমি খুব সাবধানে থেকো বৎস, মনে রেখো তোমাকে বেশিদিন এখানে থাকতে হচ্ছে না। কার্লকে যেমন করে তোক রাজি করিয়ে ও তোমাকে তাড়াবেই।

আমি এমন একটা ভাব করলাম যেন খুব অবাক হয়ে গেছি, বোকা বোকা চোখ করে রিক্সের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর বললাম, আপনি কি বলছে কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি এখানে শুধু চাকরিতে ঢুকেছি।

রিক্স দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বললো, হ্যাঁ, তুমি চাকরিতে ঢুকেছো ঠিক কথা, কিন্তু অন্য কেউ কার্লের টাকায় ভাগ বসাক, তা ভোলা চাইবে না। সমস্ত টাকা ও একাই নিতে চায়। আমার চোখকে ও ধোঁকা দিতে পারবে না। শুধুমাত্র টাকার জন্যই ও কার্লকে বিয়ে করেছে। লোলাকে চিনতে তোমার এখনও অনেক বাকি।

তাছাড়া, তুমি হয়তো জানোনা, কার্ল অত্যন্ত মিতব্যয়ী।বছরের পর বছর ও শুধু টাকা জমিয়ে গেছে; বিনা প্রয়োজনে একটা পয়সাও খরচা করেনি। কিন্তু কারোর উপকার করার সময় ও কোনো দ্বিধা না করেই টাকা খরচ করে। আর লোলা সেটা ভালোভাবেই জানে। তাই স্বামীকে চোখে চোখে রাখে–যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো বাজে খরচ না হয়। কার্ল যদি ওর অমতে কিছু করে তবে রাত্রিবেলা লোলা তার শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। তাই বলছি তুমি আর এখানে বেশি দিন নয়। লোলা হয়তো ভাবছে, ওর মতো তুমিও কালের টাকা হাতানোর ধান্দায় আছে।

আমি কোনো জবাব না দিয়ে কাজ করে চললাম। ক্ল্যাচ-প্লেটগুলো পেট্রলে ভিজিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালাম। রিক্স তখনও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করছিলো, কিন্তু আমার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখে যেন একটু অস্বস্তি বোধ করলো।

আচ্ছা–শুধু শুধু আর তোমার সময় নষ্ট করবোনা, দরজা ছেড়ে রিক্স এগিয়ে এলো, বাড়িতে একটা কাজের জন্য আমার কয়েকটা যন্ত্রপাতি দরকার। অন্য সময় কার্লের থেকেই নিয়ে যাই–কিন্তু সে তো এখন নেই, কি আর করবো বলতে বলতে সে যন্ত্রপাতির তাকের কাছে এগিয়ে গেলো, দেখি কোন্টা লাগবে–হাত বাড়িয়ে রিক্স দুটো ভ্রু ড্রাইভার আর একটা হাতুড়ি তুলে নিলো, তারপর হাত বাড়ালো একটা ড্রিল এর দিকে।

মিঃ রিক্স ওগুলো আপনাকে দিতে পারছি না বলে দুঃখিত। রিক্স থমকে দাঁড়ালো, ভাবলেশহীন মুখে ফিরে তাকালো।

আমি বললাম, মিঃ জেনসন তো এখানে নেই; তার অনুমতি ছাড়া যন্ত্রপাতি দেওয়াটা ঠিক হবে না। আপনি অপেক্ষা করুন, তিনি ফিরে এলে তাকে বলে নিয়ে যাবেন।

আমার কথায় কান না দিয়ে ও ড্রিলটা তুলে নিলো। ওর জন্য ভেবোনা দোস্ত, আমি কার্লের আত্মীয়, আমি এগুলো নিলে কার্ল কিছু মনে করবে না।

আমি তাকে বললাম যে, আমি নিরুপায়। আর আপনার যদি সেরকম দরকার থাকে, তবে দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, মিঃ জেনসন এসে পড়বেন।

রিক্সের সারা মুখ ঘেমে উঠেছে, মুখটা হয়ে উঠেছে আরো কুৎসিৎ, তাহলে তুমিও লোলার সঙ্গে ভিড়েছ? কার্লের টাকার লোভ তোমার আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। তাহলে কি লোলার সঙ্গে খাটবাজি করছো?

আমার মাথায় যেন রক্ত চড়ে গেলো, খামচে ধরলাম রিক্সের জামার কলার। দুবার ঝাঁকানি দিয়ে এক ঝটকায় দরজার দিকে ছিটকে ফেলে দিলাম।

রিক্সের হাত থেকে যন্ত্রপাতিগুলো ছিটকে পড়লো, গলায় হাত বোলাতে বোলাতে সে উঠে দাঁড়ালো। মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। চোখে ওর জ্বলন্ত দৃষ্টি, ঠিক আছে। দাঁড়া শালা কার্লকে বলে তোর ব্যবস্থা করছি। কিন্তু আমি তেড়ে যেতেই ও গাড়ির দিকে ছুটে চলে গেলো। তারপর মুহূর্তমাত্র দেরী না করে গাড়ি ছুটিয়ে দিলো।

একটু চিন্তায় পড়ে গেলাম। এ ব্যাপারটা জেনসনের কানে গেলে কি হবে কে জানে। তবে ভরসা এই রিক্সের নালিশ শোনার আগেই আমি সাফাই গাইতে পারবো।

দুপুরের দিকে মালপত্র কিনে জেনসন ফিরে এলো। গাড়ি থেকে মাল নামাতে নামাতে তাকে রিক্সের ব্যাপারটা বললাম। কিন্তু লোলার সম্বন্ধে যে কথাগুলো শুনেছি, সেগুলো চেপে গেলাম। আমি জেনসনকে বললাম, মিঃ রিক্স কিছুতেই আমার কথা না শোনায় তাকে আমি তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি।

জেনসন হাসতে আরম্ভ করলো, ঠিক করেছে। জর্জ ব্যাটা এক নম্বরের বদমাস। আগে যতবারই জিনিসপত্র নিয়ে গেছে, একবারও ফেরৎ দেয়নি। এখন লোলা আসাতে ব্যাটা জব্দ হয়েছে। তবে তোমাকে বলে রাখছি জ্যাক, আমি না থাকলে ওকে একটা জিনিসও দেবে না।

আমি নিশ্চিন্ত হলাম। জেনসন যে আমার ওপর রাগ করেনি তাতেই আমি খুশী। কিন্তু মনে হলো রিক্সকে রাগিয়ে আমি বোধহয় ভালো করিনি। এবার থেকে ওর ওপর নজর

রাখতে হবে। বলা যায় না, কোন দিন হয়তো আমার অজান্তেই ও আমার বিপদ ডেকে আনবে।

পুব আকাশে ভোরের সূর্য দেখা দিয়েছে। মরুভূমির আবহাওয়ায় একটা হালকা কুয়াশা ছড়িয়ে পড়েছে। দূরের ধূসর পাহাড়ের ছায়া যেন পরম নিশ্চিন্তে শুয়ে রয়েছে মরুভূমির বালির ওপর।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম গত তিন সপ্তাহের কথা জেনসনের কথা-লোলার কথা। এই তিন সপ্তাহ এখানে কাটানোর পর ফার্নওয়ার্থকে মনে হয় এক মিথ্যে দুঃস্বপ্ন। জীবনের সেই অধ্যায়টা যেন কেউ সযত্নে মুছে ফেলেছে স্মৃতির পৃষ্ঠা থেকে।

লোলা এখনও আমাকে সহজ ভাবে নিতে পারেনি। খুব প্রয়োজন ছাড়া কথা বলে না। কিন্তু ওর প্রভাবকে আমি কাটিয়ে উঠতে পারিনি। পিরবো কিনা জানি না।

জেনসনের মতো সহজ সরল মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। তার প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মন ভরে গেছে।

একথা ঠিক যে জেনসন লোলাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছে। কিন্তু একটু আড্ডা দেওয়ার জন্য একজন পুরুষ সঙ্গী তার দরকার ছিল। তাই আমাকে পেয়ে একেবারে মেতে উঠেছে। আমি এইরকম লোকের প্রতি কিছুতেই অকৃতজ্ঞ হতে পারবো না।

জেনসনের মুখ থেকেই শুনেছি কি ভাবে আয়কর ফাঁকি দিয়ে বছরের পর বছর সঞ্চয় করে সে এক লাখ ডলার জমিয়েছে। ওর একমাত্র ইচ্ছা আরও কিছু টাকা পয়সা জমিয়ে

লোলাকে নিয়ে পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়ে পড়বে। তবে ভোলা জেনসনের ইচ্ছার কথা এখনও জানে না।

বিছানা ছেড়ে উঠতেই নজরে পড়লো রেস্তোরাঁর বারান্দার দিকে। লোলা একটা চেয়ারে বসে। ছুরি দিয়ে তরকারি কুটছে।

আজ আমার মাইনের দিন। বাথরুমে স্নান করতে করতে ভাবছিলাম কোথায় ফার্নওয়ার্থ আর কোথায় জেনসনের আন্তরিকতা– এইভাবে যদি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যেতো।

প্রাতঃরাশ সেরে গুমটি ঘরে গেলাম। আগের দিন জেনসন একটা পুরোনো মোটর কিনে এনেছিলো, সেটা সারাতে বসলাম। কিছুক্ষণ বাদেই জেনসন এসে উপস্থিত, হাতে একগোছা নোট, জ্যাক, নাও-ধরো, এখানে আড়াইশো ডলার আছে। মাইনের চল্লিশ, রেস্তোরাঁর কমিশন একশো দশ আর সেই ইঞ্জিনটার জন্য একশো।

কিন্তু মিঃ জেনসন–এত টাকা

আরে তোমার জন্যই তো আজ আমার ব্যবসা এত ফুলে ফেঁপে উঠেছে। তুমি আসার পর থেকেই লাভের অঙ্ক দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

আমি আর আপত্তি না করে হাত বাড়িয়ে টাকাগুলো নিলাম। জেনসনকে আমি বললাম, এগুলো নিয়ে আমার কাছে মোট পাঁচশো দশ ডলার হলো, কিন্তু টাকাগুলো খরচ করার তো কোন উপায় দেখছি না। বরং যদি আপনার ব্যাঙ্কের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন, তাহলে টাকাগুলো ওখানেই রাখতে পারি।

জেনসন তো আমার কথা শুনে হেসেই অস্থির, ব্যাঙ্কে কখনো কেউ টাকা রাখে? কখন কোন্ ব্যাঙ্কে লালবাতি জ্বলবে কেউ বলতে পারে না। আমি আমার সমস্ত টাকা একটা সিন্দুকে রাখি। যখন ইচ্ছা, সুবিধা মতো খরচ করতে পারি। তাছাড়া আমার ভালোমন্দ কিছু একটা হয়ে গেলে লোলা সহজেই টাকাটা পেয়ে যাবে। আমার দিকে তাকিয়ে বললো, তুমি ইচ্ছা করলে তোমারটাও আমার কাছে জমা রাখতে পারো জ্যাক। যখন খুশী চেয়ে নেবে।

হাতের কাজ ফেলে উঠে দাঁড়ালাম। অবাক বিস্ময়ে জেনসনের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তার মানে–ঐ এক লাখ ডলার আপনি একটা সিন্দুকে রেখেছেন?

হ্যাঁ, তাতে হয়েছে কি?–হুঁ হুঁ বাবা, সে যে-সে সিন্দুক নয়, রীতিমত লরেন্স কোম্পানির সিন্দুকবাজারের সেরা। জেনসনের মুখে গর্বের হাসি আর ধরে না।

আমিও জেনসনের কথায় সায় দিলাম, সত্যিই, ওর চেয়ে আর ভালো সিন্দুক বাজারে নেই।

জেনসন আমার পিঠে একটা চাপড় দিয়ে বললো, যাও টাকাগুলো নিয়ে এসো। সিন্দুকে জমা, করে রসিদ দিয়ে দিই। দরকার পড়লেই চাইবে, লজ্জা করবে না সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবে।

তাড়াতাড়ি তোষকের তলা থেকে সব টাকা বের করে এনে জেনসনের হাতে তুলে দিলাম। সে আমাকে পাঁচশো দশ ডলারের একটা রসিদ দিলো। রসিদটা এক পলক দেখে নিয়ে পকেটে ভরলাম।

টাকাগুলো পকেটে রেখে জেনসন ঘড়ি দেখলো, বেলা হয়ে এলো। একটু পরেই বাস এসে পড়বে। প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জনের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। জ্যাক তুমি বরং রান্নাঘরে গিয়ে লোলাকে সাহায্য করো। টাকাটা রেখে এসে আমি এদিকটা সামলাচ্ছি। যাও, এখন থেকেই লেগে পড়ো।

সম্মতি জানিয়ে রেস্তোরাঁর দিকে পা বাড়ালাম।

লোলা ফ্রুট পাইগুলো জারে জারে সাজিয়ে রাখছিলো, আমি ঘরে ঢুকতেই পায়ের শব্দে ঘুরে তাকালো। ওর সবুজ চোখে ব্যঙ্গ ঝরে পড়ছে। সারা মুখে একটা চাপা কৌতুক খেলা করছে।

আমি জানতে চাইলাম কোনো কাজ আছে কিনা।

লোলা হাসলো। সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকটা ধড়াস করে উঠলো। আজ পর্যন্ত একদিনও আমাকে দেখে হাসেনি। তাহলে আজ

লোলার হাসি আরও ক্রুর হয়ে উঠলো।

মুহূর্তে বিপদের লাল সংকেত ভেসে উঠলো চোখের সামনে।

মিস্টার প্যাটমোর? কথা বলার সুরটা যেন কেমন অদ্ভুত মনে হলো।

রান্নাঘরে যাও। সকালে যে জিনিসপত্রের বাক্সটা দিয়ে গেছে ওটা আমি টেবিলের ওপর তোমার জন্য খুলে রেখে এসেছি। গেলেই দেখতে পাবে।

রান্নাঘরে গেলাম। দেখি টেবিলের ওপর ছড়ানো রয়েছে কতকগুলো খাবারের টিন, পলিথিনে মোড়া দুডজন মুরগী, তাছাড়া অন্যান্য কিছু জিনিসপত্র।

খাবারের টিনগুলোর ওপরে রাখা রয়েছে একটা ভাজ করা খবরের কাগজ, সম্ভবত কোন কিছু মোড়া ছিল। ওটা তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে খুলতে শুরু করলাম। অর্ধেকটা খুলতেই বুকের ভেতর বিস্ফোরণ ঘটলো–চোখের সামনে যেন মৃত্যু এসে দাঁড়িয়েছে

কাগজের প্রথম পাতাতেই বড় বড় হরফে লেখা

কুখ্যাত সিন্দুক লুণ্ঠনকারী আজও পলাতক তার নীচে আমার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ছাপানো ফটোটার দিকে চোখ পড়তেই অনুভব করলাম মৃত্যুর অশরীরী স্পর্শ। এমনিতে ফটোটা অত্যন্ত বাজে ছাপা হয়েছে; বলতে গেলে আমাকে চেনাই যায় না। কিন্তু লোলার তাতে এতোটুকু অসুবিধে হয়নি। দেখি ফটোটার ওপর পেন্সিল দিয়ে ও আমার গোঁফটা নিখুঁত ভাবে এঁকে দিয়েছে।

ফাওয়ার্থকে আর মিথ্যে দুঃস্বপ্ন বলে মনে হলো না। চোখের সামনে ভেসে উঠলো তার বীভৎস নারকীয় অত্যাচারের দৃশ্য।

ওকল্যান্ডের খবরের কাগজ কি করে ওয়েন্টওয়ার্থের দোকানে গেলো তা বলতে পারি না। আমার শান্তি নিরাপত্তার সুখ-স্বপ্ন এক মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেলো। লোলা নিশ্চয়ই জেনসনকে একথা বলেনি। যদি বলে থাকতো তবে জেনসনের কথাবার্তায় তা বুঝতে পারতাম। এখন তাহলে শুধু লোলার ফোন করার অপেক্ষা। ফোন পেয়েই পুলিশ ভ্যান এসে আমাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবে ফার্নওয়ার্থে।

তাড়াতাড়ি খবরের কাগজটা নিয়ে জ্বলন্ত স্টোভে গুঁজে দিলাম, দেখতে দেখতে ওটা পুড়ে ছাই হয়ে গেলো। ভাবলাম, লোলা যদি পুলিশকে জানিয়ে দেয় আমি এখানে ছিলাম, তাহলে প্রথমেই ওরা যে শহরে আমাকে খোঁজ করবে, তা হলো ট্রপিকা স্প্রিংস। আর ওকল্যান্ডে ফিরে যাবো সে সাহসও আমার নেই।

তাহলে এখন কি করা যায়?না, তার চেয়ে বরং ট্রপিকা স্প্রিংসে যাওয়া যাক। তারপর সেখান থেকে অন্য কোথাও পালানো যাবে, পাঁচশো ডলারের কথা ভাবতেই মনে হলো সেগুলো তো জেনসনের কাছে। আবার এখন যদি সে টাকা ফেরত চাই, তবে কি জেনসন সন্দেহ করবে না?

বিস্ময়-বিভীষিকায় পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। চিন্তাশক্তি যেন লোপ পেয়ে গেছে।

লোলা রান্নাঘরের দরজা খুলে ভিতরে এসে ঢুকলো, ও আমার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলে আমার মনোভাব।

আমিও অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে ওকে দেখতে লাগলাম।

ও হঠাৎ আমাকে বললো, আমাদের দুজনের একটা আলোচনা হওয়া দরকার। আজ তো তোমাকে সারারাত কাজ করতে হবে তাই না? রাতে কার্ল ঘুমোলে আমি আসবো।

বুঝলাম ও পুলিসে খবর দেয়নি। আমার সঙ্গে আলোচনা করে কোনো রফা করতে চায়। কিন্তু মনে হলো আমার নিরাপত্তার বিনিময়ে ও কিছু চাইতে পারে? আমি এখন লোলার হাতের মুঠোর মধ্যে। ও যা বলবে তা করতে আমি বাধ্য। এবং লোলাও সেটা জানে। তাই বিনা বাক্যব্যয়ে ওর কথামতো রান্নাঘর ছেড়ে খাবার ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। যাবার আগে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম ওর হলদে চোলি আর লাল প্যান্টের ওপর।.

ভারাক্রান্ত মনে বাইরে এলাম, ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়া ছাড়া আর কোন পথ পেলাম না।

একটু পরে বাস এসে পড়ায় আমরা তিনজনেই ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। রেস্তোরাঁয় খদ্দেরের ভীড় বাড়তে লাগলো।

ঘণ্টাখানেক পর বাস চলে গেলে জেনসনের কথামতো পাম্পগুলোর দিকে খেয়াল রাখার জন্য বাইরের বারান্দায় এলাম। যাক, এখানে বসে অন্ততঃ একটু ভাববার সময় পাওয়া যাবে। এতোক্ষণ পর সেই ভয়টা আবার আমাকে আঁকড়ে ধরলো। সম্ভব-অসম্ভব নানান চিন্তা এসে ভীড় করলো মাথার মধ্যে। একটা সিগারেট ধরিয়ে আয়েস করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলাম।

হঠাৎ কেমন একটা অস্বস্তি হতেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম। দেখি, লোলা রেস্তোরাঁর বাইরে বেরিয়ে এসেছে। স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। হাতে একগাদা প্লেট।

এই অপগণ্ড লোকটাকে এখানে কি জন্য এনেছো? লোলা তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, কাজের নাম নেই, বসে বসে শুধু গেলা। আমাকে একাই সব কাজ করতে হবে নাকি?

লোলা–চাপা স্বরে ধমকে উঠলো জেনসন। আমি জ্যাককে বলেছি এখানে বসতে। পাম্পগুলো দেখতে।

আমি চেয়ার ছেড়ে রেস্তোরাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম, ভুল হয়ে গেছে মিসেস জেনসন, এবারকার মতো মাপ করুন।

লোলা ঝড়ের বেগে চলে গেলো বাংলোর দিকে। ভেতরে ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলো।

লোলা চলে যাওয়ার পর লক্ষ্য করলাম জেনসনের মুখে দুশিন্তার ছায়া। আমি যতদূর সম্ভব তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম। আমি সবই বুঝতে পারছি। কিন্তু কি করে জেনসনকে বলি এ ব্যাপারটা পুরোটাই একটা সাজানো নাটক; আজ রাতে আলাদা শোবার ব্যবস্থাটা পাকাপাকি করার জন্যই লোলার এই অভিনয়।

রান্নাঘরে দুজনে কাজ করছি। হঠাৎ কানে এলো গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ। উঠে দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে উঁকি মারলাম–লোলা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। পরনে সেই সবুজ পোশাক। ও গাড়ি ছুটিয়ে দিলো ওয়েন্টওয়ার্থের দিকে, চমকে উঠলাম! কোথায় যাচ্ছে লোলা? থানায় না তো?

জেনসন আমার দিকে তাকিয়ে বললো, জানো জ্যাক, মাঝে মাঝে ওর জন্য আমার দুঃখ হয়, আমার সঙ্গে ঝগড়া হলেই ও ওরকম করে। ভাবি প্রথম জীবনে হয়তো খুব কষ্ট করতে হয়েছে, তাই ওর ব্যবহার এরকম। ভেবেছিলাম তুমি আসার পর আমরা দুজনে একটু নিশ্বাস ফেলার সুযোগ পাবো, কিন্তু কোনদিনই কোথাও যাবার জন্য ওকে রাজি করাতে পারিনি। যাকগে ওসব কথা বাদ দাও। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে আবার কাজে মন দিলো।

এরপর গাড়ির ভীড় বাড়তে শুরু করায় কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম

রাত প্রায় সোয়া এগারোটায় লোলা ফিরলো। গাড়ি থেকে নেমে সোজা গিয়ে ঢুকলো নিজের ঘরে। সশব্দে বন্ধ করে দিলো ঘরের দরজা।

জেনসন ভারী পদক্ষেপে বাংলোর দিকে এগিয়ে চললো। বিষাদের ছায়া তখনও ওর মুখ থেকে মিলিয়ে যায় নি।

রেস্তোরাঁর বারান্দায় বসে শ্রীমতীর অপেক্ষা করতে লাগলাম। জেনসন ঘুমিয়ে না পড়লে লোলা আসতে পারবে না। সুতরাং একটু সময় লাগবে। একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোয়া ছাড়লাম। ভাবতে লাগলাম নিজের বর্তমান অবস্থার কথা।

যদি জেনসনের কাছে টাকাগুলো না রাখতাম, তাহলে কখন হাওয়া হয়ে যেতাম। কেউ আমার খোঁজও পেতো না। কিন্তু এই কপর্দকহীন অবস্থায় পালাবার চিন্তা করা শুধুই পাগলামি।

সুতরাং মাথায় চিন্তার পাহাড় নিয়ে লোলার আসার অপেক্ষায় বসে রইলাম। চোখদুটো আটকে রইলো বাংলোর আলোকিত জানলার দিকে।

.

০৬.

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম রাত একটা চল্লিশ বাজে। চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম–হঠাৎ বাংলোর দরজায় চোখ পড়লো, লোলা চুপিসাড়ে বেরিয়ে আসছে। অবসন্নভাবে পা ফেলে ও আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। পরনে একটা সাদা শার্ট আর ফিকে সবুজ রঙের স্কার্ট।

রেস্তোরাঁর বারান্দা অন্ধকারে ঢাকা। সামনের খোলা উঠোনে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। লোলা বারান্দায় উঠে এসে চেয়ার টেনে নিয়ে আমার কাছে বসলো।

মনকে তৈরী করলাম। বুঝতে পারলাম না, কি শর্তের বিনিময়ে ও আমার নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখবে।

সিগারেটের হালকা লাল আলোয় লোলার মুখটা অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।

তোমাকে দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেছি, কারসন। প্রথম থেকেই সন্দেহ করেছিলাম, তুমি ছদ্ম পরিচয়ে এখানে আছে। কিন্তু তুমি যে ফার্নওয়ার্থ থেকে পলাতক–শেট কারসন, তা ভাবতে পারিনি–আর তোমার সিন্দুক বিশারদ হওয়াটা নিতান্তই ভগবানের আশীর্বাদ।

আপনি কি পুলিশে খবর দিতে চান?

লোলা জানালো এখনও সে কিছু ঠিক করেনি। সেটা আমার মতামতের ওপরই নাকি নির্ভর করবে। আমি ওর কথায় রাজী হলে ভালো না হলে সোজা ফার্নওয়ার্থ। ও আরো বললো যে, কাগজে লিখেছে তুমি লরেন্স সেফস্ কর্পোরেশন-এ কাজ করতে–তোমাকে একটা সিন্দুক খুলতে হবে কারসন! কার্লের একটা লরেন্স সিন্দুক আছে–তোমাকে সেটা খুলতে হবে।

সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে বসলাম। তাহলে রিক্স দেখছি মিথ্যে কথা বলেনি। লোলা শুধুমাত্র টাকার লোভেই জেনসনকে বিয়ে করেছে।

সিন্দুক থেকে কিছু যদি আপনার নেবার থাকে তো, মিঃ জেনসনকে বলছেন না কেন? আমি বোকা সাজার চেষ্টা করলাম, কারণ লোলার উদ্দেশ্যটা আমি ওর মুখ থেকেই শুনতে চাই।

বেশী চালাক সাজবার চেষ্টা করো না, কারসন। বিকেলে কি বলেছিলাম তা আশা করি ভুলে যাওনি? এখন থেকে আমি যা বলবো, নয়তো

রিক্সের কথাই দেখছি সত্যি! শুধু টাকার জন্যই এতোদিন এখানে পড়েছিলেন?

বাজে কথা ছেড়ে কাজের কথায় এসো, সিন্দুক তুমি খুলছো কিনা বল?

খোলার পর?

লোলা নড়েচড়ে বসলো, অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলো, তুমি এক হাজার ডলার পাবে, আর পালিয়ে যাবার জন্য চব্বিশ ঘণ্টা সময় তোমাকে দেওয়া হবে।

আমি মনে মনে লোলার বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারলাম না। আমি সিন্দুক খুলবো আর এক লাখ ডলার তুমি হাতাবে। তারপর দয়া করে আমাকে এক হাজার ডলার ভিক্ষে দেবে। আর পালাবার জন্য, কিছু সময়! আর তাও কিনা জেনসন থেকে শুরু করে পুলিশ পর্যন্ত সবাই যাতে ভাবে, আমিই সিন্দুকের টাকাটা হাতিয়ে কেটে পড়েছি! চমৎকার–তোমার জবাব নেই সুন্দরী!

আমি লোলাকে বললাম, আপনি ঐ এক লাখ ডলার চুরি করার মতলবে আছে, আর মিঃ জেনসন ভেবেছিলেন আপনাকে নিয়ে পৃথিবী ভ্রমণে যাবেন।দু-হাতে খরচ করবেন, সব আপনারই জন্য। শ্লেষে আমার গলার স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। লোলাকে যেন আর সহ্য করতে পারছি না। আমার বেশী রাগ হলো জেনসনের মতো লোককে ও ঠকিয়েছে বলে।

অন্ধকারে অনুভব করলাম লোলা তাকিয়ে রয়েছে কারসন, আমার মনে হয় সিন্দুকটা। খুললেই তোমার ভালো হবে।

আমি বেশ বুঝতে পারলাম সিন্দুকটা আমাকে খুলতেই হবে। এছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু জেনসনের কথা ভাবতেই আমার খারাপ লাগছে। সে আমার একমাত্র বন্ধু, শুভাকাঙ্খী–আমার কত উপকার করেছে, আর তাকেই এভাবে পথে বসাবো? অথচ ফার্নওয়ার্থের কথা মনে পড়তেই ভয়ে একেবারে শিউরে উঠছি।

আমি লোলাকে প্রশ্ন করলাম, সিন্দুকটা কোন্ ঘরে আছে?

লোলা বললো, বাংলোর বসার ঘরে। আগামী শনিবার সন্ধ্যেবেলা কাল ওয়েন্টওয়ার্থে একটা মিটিং এ যাবে। তারপর রাত একটায় ফিরবে। ওর মধ্যেই কাজটা শেষ করতে হবে।

একটা সিগারেট ধরলাম। লাইটারের আলোয় দেখলাম, লোলার চোখ জোড়া লোভে চক্‌চক্। করছে। কারো আসন্ন মৃত্যুর প্রত্যাশায় যেন অপেক্ষা করছে এক বিশাল শকুনি।

আমি জানতে চাইলাম সিন্দুক খোলার সময় লোলা কোথায় থাকবে?

লোলা বললো, শনিবার তোমার জায়গায় আমি সারারাত কাজ করবো। তুমি যখন সিন্দুক খুলে টাকা নিয়ে হাওয়া হবে, তখন আমি রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত থাকবো।

টাকা যে চুরি গেছে সেকথা লোকে জানবে কিন্তু আমি কিছুই জানতে পারবো না। অন্ধকারের মধ্যে ঝকঝক করে উঠলো লোলার দাঁতের সারি।

আমিও মনে মনে এক মতলব আঁজলাম। এমনিতেই তো আমাকে পালাতে হবে, ক্ষতির মধ্যে শুধু চাকরিটা–তা যাকগে। কিন্তু জেনসন যাতে আমাকে ভুল না বোঝে, সে ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে। মতলবটা যে কার্যকরী হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমি সিন্দুক খোলার পর লোলা যখন টাকাগুলো নিতে থাকবে তখন এক ঘুষিতে ওকে অজ্ঞান করে সমস্ত টাকা নিয়ে পালাবো। যাবার আগে টেলিফোনের তার কেটে দিয়ে যাবো। তারপর ট্রপিকা স্প্রিংস থেকে জেনসনের সমস্ত টাকা ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করবো। সঙ্গে একটা চিঠিও লিখে পাঠাবো কি ধরনের এক বাজারের মেয়েকে সে বিয়ে করেছে। তাহলে নিশ্চয়ই জেনসনের ভুল ভাঙবে।

মুখে খুব একটা কিছু বললাম না। শুধু বললাম দেখুন মিসেস জেনসন মিঃ জেনসনকে ঠকানোটা আমার ঠিক ভালো লাগছে না। তিনি আমার জন্য কত করেছেন, তাছাড়া।

ওসব ন্যাকামো রাখো, কারসন।

সোজাসুজি বলো সিন্দুক খুলছে, না ফার্নওয়ার্থে ফিরে যাবে?

আর যেখানেই যাই, ফানওয়ার্থে আমি ফিরছি না।

লোলার দিকে চোখ তুলে তাকালাম, অতোবার করে আপনাকে বলতে হবেনা। যখন বলেছি খুলবো, তখন খুলবো। তাই যেন হয়, মিস্টার শেট কারসন। লোলা বাংলোর দিকে এগিয়ে চললো। দেখতে পেলাম, যেতে যেতে ও একবার পিছন ফিরে তাকালো, মুখে জয়ের হাসি।

সিগারেটের টুকরোটা বালির ওপর ছুঁড়ে দিলাম, দেখা যাক সুন্দরী, কে হারে আর কে জেতে।

পরদিন লোলাকে রান্নাঘরে একা পেয়ে সিন্দুকের নম্বরটা এনে দিতে বললাম। কারণ ওটা না পেলে সিন্দুকটা কি ধরনের তা বোঝা যাবে না। আর সিন্দুক ভাঙতে হলে সেটা অবশ্যই জানা প্রয়োজন, পরে জেনসনের অনুপস্থিতির সুযোগে ও এক টুকরো কাগজ এনে আমার হাতে দিলো। নম্বরটা দেখেই বুঝলাম সিন্দুকটা অত্যন্ত পুরনো মডেলের বাজারে এখন আর পাওয়াই যায় না। লোকে এই ধরনের চাবি-ছাড়া সিন্দুক অপছন্দ করায় কোম্পানি এই সিন্দুক তৈরী বন্ধ করে দেয়, কেননা এ ধরনের সিন্দুকগুলোর দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে তালা এঁটে যায়। এছাড়া এই সিন্দুকগুলো খুলতে চোর-গুণ্ডাদের খুব একটা কষ্ট করতে হবে না।

ভাবতে ভালো লাগলো যে সিন্দুক খুলতে বড় জোর আমার দশ মিনিট লাগবে। আর সময় যতো কম লাগবে, ততোই ভালো–পালাবার জন্য কিছু বেশী সময় পাওয়া যাবে।

পরদিন সকালবেলা আমি আর জেনসন গ্যারেজে কাজ করছি। হঠাৎ কাজ থামিয়ে ও বলে উঠলো জ্যাক, শনিবার সাতটায় আমাকে ওয়েন্টওয়ার্থে যেতে হবে,–একটা মিটিং আছে। ফিরতে ফিরতে একটা দেড়টা বাজবে।-লোলা সেদিন রাত্তিরে কাজ করবে বলছিলো, তুমি পারো তো ওর দিকে একটু লক্ষ্য রেখো। বলা যায় না, কখন কোন মাতাল ড্রাইভার উল্টোপাল্টা কাজ করে বসে।

বুকের ভেতর একটা চাপা দুঃখ অনুভব করলাম। জেনসন আমাকে এতখানি বিশ্বাস করে? একবারও ভেবে দেখলো না যে লোলাকে একা পেয়ে আমিও তো কোনো মাতাল ড্রাইভারের মতো কাজ করতে পারি। আমি বললাম, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, মিঃ জেনসন, আমি অবশ্যই নজর রাখবো।

জেনসন হেসে বললো, তোমার মতো একজন বিশ্বাসী তোক পেয়ে আমার অনেক সুবিধা হয়েছে, জ্যাক–তোমাকে চিনতে আমি ভুল করিনি।

আমি জেনসনের থেকে ওর গাড়িটা চেয়ে নিলাম ট্রপিকা স্প্রিংসে কয়েকটা জিনিস কেনাকাটা করার জন্য আর চাইলাম একশো ডলার। জেনসন একটু অবাক হলেও আমার কথা রাখলো। জেনসনের কাছ থেকে তখনকার মতো বিদায় নিয়ে আমি গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম। লোলা রেস্তোরাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে আমায় লক্ষ্য করছে। যদি জানতো যে ওর জন্য আমি কি ফঁদ পেতেছি, তবে ওখানে আর হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকতো না।

ট্রপিকা স্প্রিংসে পৌঁছতে প্রায় ঘণ্টাচারেক সময় লেগে গেলো। সেখানে পৌঁছেই খোঁজ নিলাম ন্যু–ইয়র্কের ট্রেন কটায় ছাড়ে। প্লেনে করে পালানোর মতলব অনেক ভেবেচিন্তেই ত্যাগ করেছি। কারণ লোলা পুলিশে আমার খবর দেওয়া মাত্রই অর্থাৎ পুলিশ আমার পালানোর খবর পেলেই ট্রপিকা স্প্রিংসের এয়ারপোর্টে আমার খোঁজ করবে। তাছাড়া রাত্রিবেলা প্লেনে যাবো কিনা, তারও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। খোঁজ নিয়ে দেখলাম, রাত সাড়ে বারোটায় ন-ইয়র্কে যাবার একটা ট্রেন আছে। অতএব চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই। জেনসন সাতটায় ওয়েন্টওয়ার্থে রওনা হবে। আর সাড়ে সাতটার মধ্যে সিন্দুক খুলে লোলাকে ল্যাং মেরে আমিও কেটে পড়বো, তাহলে ট্রপিকা স্প্রিংসে পৌঁছে ট্রেন ধরার জন্য আধঘণ্টারও বেশী সময় পাওয়া যাবে। সহজে যাতে পুলিশের চোখে না পড়ি তাই আমার সাজ-পোশাক পরিবর্তন করার কথা ভাবলাম। ঠিক করলাম ছদ্মবেশ ধরে পুলিশের চোখে ধুলো দিতে হবে।

তাই ট্রেনের খোঁজখবর নিয়ে একটা দোকানে গেলাম। একটা হালকা বাদমী প্যান্ট আর একটা ছাই রঙের কোট কিনলাম। কোটের সামনের পকেট দুটো গাঢ় সবুজ রঙের, যাতে বহুদুর থেকে চোখে পড়ে। আরো কিনলাম একজোড়া জুতো, গাঢ় বাদামী রঙের একটা টুপি, এক শিশি কলপ ও একটা গগ। এই জিনিসগুলো একটা সুটকেস কিনে তাতে ভরে ফেললাম। গাড়ির ক্যারিয়ারে সুটকেসটা বন্ধ করে ফিরে চললাম পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন-এ।

আঁকাবাঁকা পাহাড়ী রাস্তা পার হয়ে মরুভূমিতে এসে পড়লাম। দূরের বালিয়াড়ির ওপর ইতস্ততঃ ছড়ানো ঘন ক্যাকটাসের ঝোঁপ। গাড়ি থামিয়ে ক্যারিয়ার থেকে সুটকেসটা বের করে এগিয়ে চললাম ক্যাকটাস ঝোঁপের দিকে। একটা ঘন ঝোঁপের মধ্যে ওটাকে লুকিয়ে ফেললাম। একমাত্র আমি ছাড়া অন্য কারো পক্ষে এটা খুঁজে বের করা একেবারেই অসম্ভব।

পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন ছেড়ে পালাবার পথে এখানে নেমে চেহারা এবং বেশবাস সমস্ত পাল্টে নেবো। তারপর ট্রপিকা স্প্রিংস থেকে ট্রেন ধরে সোজা নু-ইয়র্ক। লোলা আমার চেহারার বর্ণনা দিলেও পুলিশ আমাকে ছদ্মবেশে চিনতে পারবে বলে মনে হয় না।

নিশ্চিন্ত মনে আবার গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম। ফিরে এসেই কাজে মন দিলাম। যান্ত্রিক ক্ষিপ্রতায় আমি জেনসন এবং লোলা–তিনজনেই কাজ করে চললাম। রাত প্রায় এগারোটার সময় রেস্তোরাঁ একেবারে ফাঁকা হয়ে পড়লো। শেষ খদ্দেরটি চলে যাবার পর জেনসন আমাকে পেট্রল পাম্পগুলো দেখতে বলে শুতে চলে গেলো।

আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে বাইরে এসে বসলাম। চেয়ারে হেলান দিয়ে পয়েন্ট অফ নো রিটার্নকে আর একবার ভালো করে দেখলাম। আর মাত্র একটা দিন তারপর এ জায়গা ছেড়ে আমাকে চিরকালের জন্য চলে যেতে হবে। আজই প্রথম অনুভব করলাম, পয়েন্ট অফ নো রিটার্নকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি। এ জায়গা ছেড়ে যেতে আমার মন চাইবে না।

শনিবার সন্ধ্যে সাতটা। গুমটিঘরে সেই পুরোনোমোটরটা নিয়ে কাজ করছিলাম, পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকালাম, সামনেই দাঁড়িয়ে জেনসন।

জ্যাক আমাকে এখনই যেতে হবে। সাতটা বাজে, আর দেরী করা ঠিক হবেনা।ফিরতে ফিরতে হয়তো দুটোও বেজে যেতে পারে।

জেনসন রেস্তোরাঁর দিকে পা বাড়ালো। সম্ভবতঃ লোলার কাছ থেকে বিদায় নিতে। একটু পরে সে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এসে সোজা গাড়িতে গিয়ে উঠলো।

ঝড়ের বেগে ছুটে চললো জেনসনের মার্কারি, যতোদূর দেখা গেলো চেয়ে রইলাম।

আমি বাংলোর দিকে পা বাড়ালাম সেই অভিশপ্ত সিন্দুক খোলার জন্য। অভিশপ্ত এই কারণেই বললাম যে এর জন্যই তো আমাকে জেনসনের মতো লোকের বন্ধুত্ব হারাতে হচ্ছে।

লোলা বাংলোর দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলো আমার জন্য উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠায় ওর মুখমণ্ডল বিবর্ণ, কিন্তু চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল। আমাকে দেখেই চাপা স্বরে বলে উঠলো, তাড়াতাড়ি শুরু করো কারসন।

আমি সিন্দুকটা কোথায় আছে জেনে নিয়ে লোলাকে পাম্পের কাছে থাকতে বললাম কেননা তেল নেবার জন্য কোনো ট্রাক এসে পড়তে পারে।

লোলা চলে যাবার পর বসবার ঘরে গিয়ে সোফাটা সরিয়ে সিন্দুকটাকে এক নজরে দেখলাম। যা ভেবেছি তাই। শুধু কম্বিনেশন ঘোরালেই সিন্দুকটা খুলে যায়–চাবির আর প্রয়োজন হয় না। লোলা দরজায় দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ্য করছিলো। ওকে বললাম, গ্যারেজ থেকে কয়েকটা যন্ত্রপাতি আনতে হবে। আপনি বরং রেস্তোরাঁটা বন্ধ করে দিন। নয়তো কোনো খদ্দের এসে চীৎকার শুরু করে দেবে।

লোলা জানালো যে, সে অনেক আগেই রেস্তোরাঁ বন্ধ করে দিয়েছে। আমি আর সময় নষ্ট না করে ওকে পাশ কাটিয়ে বাংলো ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। গ্যারেজ থেকে গোটা কয়েক যন্ত্রপাতি নিয়ে একটা বড় ক্যাম্বিসের ব্যাগে ভরে বাংলোয় ফিরে চললাম। টাকাগুলো এই ব্যাগে নিয়েই পালাতে হবে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম একটা পুরোনো ঝরঝরে প্যাকার্ড এগিয়ে আসছে। লোলা গাড়িটাকে দেখতে পেয়ে পাম্পের দিকে এগিয়ে এলো। আমি আর অপেক্ষা না করে বাংলোর দিকে এগিয়ে গেলাম। নিছক কৌতূহল বশে গাড়িতে বসে থাকা লোক দুটোর দিকে এক পলক তাকালাম–শরীরের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ খেলে গেলো। পা দুটো যেন পাথর হয়ে গেলো। যেন কেউ আঠা দিয়ে আটকে দিয়েছে মেঝেতে

গাড়িতে বসে দুজন পুলিস! আমি তখন ঘামতে শুরু করেছি। পায়ে পায়ে বাংলোর দিকে এগিয়ে গেলাম।

অ্যাই—শোনো–বাজখাই গলায় একজন ডেকে উঠলো। পুলিস দুজন গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে এসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমায় লক্ষ্য করছে।

লোলাও বুঝতে পেরেছিলো লোক দুটোর আসল পরিচয়। দেখলাম ও ভয়ার্ত চোখে ওদের দিকে চেয়ে আছে।

আমি ধীরে ধীরে ওদের দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু যতোখানি ভয় পেয়েছিলাম তা নয়। ওরা জানালো যে, ওদের একটা চাকা আসবার পথে ফেঁসে গেছে। গাড়ির ক্যারিয়ারের চাবিটা আমার হাতে দিল, এবং চটপট সারাবার ব্যবস্থা করতে বললো।

আমি আর দেরীনা করে ক্যারিয়ার খুলে চাকাটা বের করলাম। ওরা লোলার দিকে তাকালো। আঙুল দিয়ে গাড়িটাকে দেখালো, এটাতে পেট্রল ভরার ব্যবস্থা করো; আর দ্যাখো খাবার দাবার কিছু আছে কিনা।

লোলা একটু ইতস্ততঃ করলেও রেস্তোরাঁ যে বন্ধ সে কথা বলতে আর সাহস করলো না।

যাই হোক আটটা দশের সময় হতচ্ছাড়া পুলিশ দুটোর হাত থেকে নিস্তার পেলাম। কিন্তু আসল কাজ আর হলো না। খদ্দেরের পর খদ্দের আসতে লাগলো। অবশেষে বাধ্য হয়ে রেস্তোরাঁ খুলতে হলো। আমি আর লোলা অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করে চললাম।

রাত প্রায় দশটার সময় নিঃশ্বাস ফেলার একটু সুযোগ পেলাম। সামনে এঁটো কাপ প্লেটের প। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে লোলা।

আমি এগুলো ধুয়ে রাখছি। তুমি গিয়ে সিন্দুক খোলো।

আমি লোলাকে বললাম যে, আজ অনেক দেরী হয়ে গেছে। এর জন্য অন্য একটা দিন ঠিক করতে হবে।

লোলা আগুন ঝরা চোখে আমার দিকে তাকালো, আশা করি আমার কথাটা তোমার কানে গেছে কারসন।

আর ঘণ্টা চারেকের মধ্যেই তো মিঃ জেনসন ফিরে আসবেন, তাহলে পালাবার সময়টা আমি পাবো কখন?

লোলা কোনো জবাব না দিয়ে রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। যাবার আগে বলে গেলো এখনও ভেবে দেখো কি করবে।

বুঝলাম ও মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছে না। পুলিশকে জানাতেও পারে। সুতরাং আর দেরী না করে গ্যারেজে গেলাম। যন্ত্রপাতির ব্যাগটা নিয়ে আবার ফিরে চললাম বাংলোর দিকে।

এখন দশটা বেজে দশ মিনিট। অর্থাৎ তিনটের আগে ট্রপিকা স্প্রিংসে পৌঁছনো অসম্ভব, সেখানে গিয়ে প্রথমেই আমাকে স্টেশন ওয়াগনটার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ জেনসন পুলিশকে যখনই জানাবে আমি স্টেশন ওয়াগনে করে পালিয়েছি ওরা ট্রপিকা স্প্রিংসে

এসে আগে ওটারই খোঁজ করবে। তারপর আমাকে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ভাগ্য সহায় থাকলে হয়তো পুলিশের চোখে ধুলো দিতে পারবো।

বসবার ঘরে গিয়ে আলো জ্বেলে দিলাম। তারপর যন্ত্রপাতি নিয়ে সিন্দুকের কাছে হাঁটু গেড়ে বসলাম।নম্বর বসানো চাকতিটা একটু একটু করে ঘোরাতে আরম্ভ করলাম।ঝুঁকে পড়ে ইস্পাতের দরজায় কান চেপে রইলাম। একুট পরেই খুটকরে একটা শব্দ হলো। অর্থাৎ প্রথম নম্বরটা মিলে গেছে। সিন্দুক সম্বন্ধে যাদের অভিজ্ঞতা আছে, তারা ঐ সামান্য শব্দ শুনেই বুঝতে পারে নম্বরটা ঠিক মতো মিলেছে কিনা। এবার দ্বিতীয় সারির চাকতি নিয়ে পড়লাম–

মিনিট দশেক পর হাতল টেনে সিন্দুকের দরজা খুলে ফেললাম। চোখের সামনে থাকে থাকে সাজানো একশো ডলার নোটের একশোটা বাণ্ডিল। এক লাখ ডলার-জেনসনের সারা জীবনের সঞ্চয়।

ক্যাম্বিসের ব্যাগটা টেনে নিয়ে নোটের বান্ডিলের দিকে হাত বাড়ালাম।-একি! জ্যাক!! তুমি এখানে কি করছো!!!

একটা উত্তপ্ত ইস্পাতের ফলা যেন আমার বুকটাকে এফোঁড় ওফোড় করে দিলো-কিছুক্ষণ নিশ্চল হয়ে বসে রইলাম–একটা হাত নোটের বাণ্ডিলের ওপর স্থির-সময়ের তরঙ্গ থেমে রইলো ঐ একটি বিশেষ মুহূর্তে

ধীরে ধীরে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম।

দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে জেনসন, চোখ দুটো যেন লাফিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আমি তখন অসাড় হয়ে গেছি, ফ্যাল ফ্যাল করে জেনসনের দিকে তাকিয়ে রইলাম, জেনসন ভারী পা ফেলে ঘরের ভেতর এসে দাঁড়ালো, জ্যাক! এ তুমি করছো কি? সমস্ত যন্ত্রণা, হতাশা ঝরে পড়লো তার কণ্ঠে। লজ্জায় ঘৃণায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করলো। জেনসনের বিশ্বাসের স্বর্গ আমি নিষ্ঠুর ভাবে গুঁড়িয়ে দিয়েছি।

ধীরে ধীরে উঠেদাঁড়িয়ে বললাম, আমি অত্যন্ত দুঃখিত, মিঃ জেনসন। আপনি হয়তো ভাবছেন আপনার টাকা আমি চুরি করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু নয়। যদিও জানি, একথা বিশ্বাস করা আপনার পক্ষে খুব কঠিন, তবু দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবেন না।

এমন সময় ঘরের দরজায় লোলা এসে দাঁড়ালো। ওর সারা শরীর উত্তেজনায় কাঁপছে। জেনসনকে দেখেই তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল কি হয়েছে, কার্ল?–একি? ও সিন্দুক খুলছে? আমি আগেই জানতাম। তোমাকে বারবার সাবধান করেছি–অচেনা লোককে কখনো বিশ্বাস করো না। এখন বুঝতে পারছো তো?

জেনসনের কানে লোলার কথাগুলো ঢুকলো কিনা কিছুই বোঝা গেলো না। সে তখন একই ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমাকে বললো, জ্যাক, তুমি এভাবে–তার অর্ধসমাপ্ত কথাগুলো চাবুকের মতো আমার বিবেকের ওপর আছড়ে পড়লো।

কিন্তু মিঃ জেন–

এর পরেও কি তোমার কিছু বলার আছে?

হ্যাঁ আছে। আমার নাম জ্যাক প্যাটাের নয়, শেট কারসন। মাস দেড়েক হলো আমি ফার্নওয়ার্থ থেকে পালিয়ে এসেছি। একটা কাগজে আমার ছবি দেখে মিসেস জেনসন আমাকে চিনতে পারেন, এবং আমি যদি সিন্দুক না খুলি, তবে পুলিশে ধরিয়ে দেবেন বল ভয় দেখান।

লোলা গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে উঠলো, চোর মিথ্যেবাদী কোথাকার! কার্ল! তুমি এই লোকটার কথায় কান দিও না। নিজেকে বাঁচাবার জন্য ও মিথ্যে কথা বলছে! আমি এখুনি পুলিশে ফোন করছি।

জেনসন ধীরে ধীরে লোলার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, তুমি এর মধ্যে নাক গলাতে এসো না। পুলিশ ডাকবো কি ডাকবো না, সেটা আমি বুঝবো, যেটা ভালো হয় আমিই করবো।

লোলা দেওয়ালে হেলান দিয়ে গোখরো সাপের মতো ফুঁসতে লাগলো। ওর সবুজ চোখের তারায় ভয়ার্ত সতর্ক দৃষ্টি।

আমি একে একে জেনসনকে সমস্ত কিছু জানালাম। টাকাটা যে তাকে ফেরৎ পাঠাতাম, তাও বললাম।

সব শুনে জেনসন ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। মনে হলো এই অল্প সময়ের মধ্যেই তার বয়স যেন অনেক বেড়ে গেছে। লোলার দিকে তাকিয়ে বললো, শুতে যাও লোলা। এ ব্যাপার নিয়ে কাল আলোচনা করা যাবে। আজ আর তোমাকে রাত জাগতে হবে না। যাও শুয়ে পড়ো গিয়ে।

লোলা পায়ে পায়ে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিলো পুলিশকে ফোন করার জন্য।

জেনসন এগিয়ে গিয়ে ওর হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান মারলো, ফোন করার ব্যাপারটা আমি ভাববো!

ঘর থেকে এক ধাক্কায় ওকে বের করে দিয়ে এসে সোফায় বসলো।

তখনও আমি ভোলা সিন্দুকের কাছে দাঁড়িয়ে আছি।

কি আশ্চর্য ব্যাপার দ্যাখো, জ্যাক! আমাদের সভাপতি হঠাৎ হার্টফেল করায় মিটিং মাঝপথে ভেঙে গেলো। অদ্ভুত ব্যাপার একজন মারা গেলো, আর তার জন্য আমি আবিষ্কার করলাম আমার বউ একটা বাজারে মেয়ে।

তার কথায় চমকে উঠলাম, তার মানে আপনি আমার কথা বিশ্বাস করেছেন?

জেনসন আমার দিকে চোখ তুলে তাকালো। একটা বিষয় বেদনার ছায়া ওকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরেছে। চোখের মণির ওপর অশ্রুর আস্তরণ। সে মৃদুস্বরে বললো, জ্যাক, তোমাকে আগেই বলেছিলাম, লোক চিনতে আমার ভুল হয় না। কিন্তু স্ত্রীলোকের ব্যাপারে আমি একেবারেই অজ্ঞ। এখনই তা বুঝতে পারছি।

আমি মিঃ জেনসনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, বুঝতেই তো পারছেন, এছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিলো না–অনেকক্ষণ পরে বুক ভরে শ্বাস নিলাম। মনটা অনেক হাল্কা হলো।

জেনসন আমাকে জানালো যে, আমাকে এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে কেননা এ জায়গাটা আমার পক্ষে নিরাপদ নয়। লোলা যে ভাবেই হোক পুলিশকে জানাবে। আমাকে কিছু টাকা দিয়ে স্টেশন ওয়াগনটা নিয়ে বেরিয়ে পড়তে বললো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, কেননা যে কোনো সময় বিপদ ঘটতে পারে। জেনসন আমাকে তিরিশ হাজার ডলার দিতে চাইল ন-ইয়র্ক গিয়ে ব্যবসা করার জন্য। আমি আপত্তি জানালাম। কিন্তু কোনো ফল হলো না। জেনসন বললো, জ্যাক, আমি যখন বলছি, এ টাকা তোমাকে নিতেই হবে। পৃথিবী ভ্রমণের শখ আমার মিটে গেছে। সুতরাং এ টাকা আমার আর কোনোকাজে লাগবেনা।কিন্তু তোমার এখন টাকার প্রয়োজন, তাই তোমাকে দিচ্ছি।আর একটা কথা মনে রেখো-জ্যাক, তোমাকে আগে যেমন ভালোবাসতাম, এখনও তেমনি বাসি। জেনসনের চোখের কোণে চিকচিক করছে দুফোঁটা অশ্রু।

ঠিক তখনই লোলাকে দেখলাম। ও দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। পরনে একটা সবুজ পোশাক, মুখ শুকনো পাতার মতো বিবর্ণ, চোখ দুটো বেড়ালের মতো জ্বলছে। আর এক হাতের মুঠোয় ধরা রয়েছে একটা ৪৫ বোরের রিভলভার।

.

০৭.

ঘরের পরিবেশে নেমে এলো মৃত্যুর নিঃস্তব্ধতা। শুধু টেবিল ঘড়ির টিকটিক আর লোলার উত্তেজিত শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো জেনসন। লোলা কর্কশ স্বরে শাসিয়ে উঠলো খবরদার এক পা নড়বে না। সিন্দুকের সমস্ত টাকা আমি নেবো। কাউকে এর একটা পয়সাও আমি দিচ্ছি না!

লোলা! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেলো? গুলিভরা রিভলভার নিয়ে আর ছেলেমানুষি কোরো না-ওটা নামিয়ে রাখো। জেনসন আরো বললো, লোলা, দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে এ টাকা আমি তোমার জন্য সঞ্চয় করেছি। এখন ওসব পাগলামী ছেড়ে বন্দুকটা নামিয়ে রাখো।

ওসব বাজে কথায় আমার মন ভুলবে না। আমাকে আটকালে আমি পুলিশকে বলে দেবো, একজন জেল পালানো কয়েদীকে তুমি এতোদিন ধরে জেনেশুনে আশ্রয় দিয়েছে। আরো জানাবো যে আয়কর ফাঁকি দিয়ে জমানো এই একলাখ ডলারের কথা।

রাগে জেনসনের চোখ মুখ লাল হয়ে উঠলো। সে এক পা এক পা করে লোলার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো।

সাবধান মিঃ জেনসন–তীক্ষ চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে সিন্দুকের দরজায় হাঁটু দিয়ে মারলাম এক ধাক্কা। দরজা সশব্দে বন্ধ হওয়া মাত্রই স্বয়ংক্রিয় তালা ক্লিক করে এঁটে গেলো।

লোলা আমার দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকালো। পলকে বুঝতে পারলো স্বয়ংক্রিয় ভাবেই সিন্দুকের দরজায় তালা এটে গেছে। অন্ধ ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে, হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ও এগিয়ে এলো–তারপর রিভলভারের বিকট শব্দে জানলার শার্সিগুলো কেঁপে উঠলো ঝনঝন করে।

জেনসন লোলার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। ভয়ার্তচোখে তার দিকে তাকালাম। কয়েক সেকেন্ড পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে রইলো জেনসনের বিশাল দেহ, পরমুহূর্তে হাঁটু ভেঙে দড়াম করে আছড়ে পড়লো মেঝেতে। পড়বার সময় হাত দুটো পাশের টেবিলটা আঁকড়ে ধরায় সেটাও হুড়মুড় করে উল্টে পড়লো। গোটা বাংলোটাই থরথর করে কেঁপে উঠলো।

লোলার ভয়ার্ত চীৎকারে সম্বিৎ ফিরে পেলাম। তখন ওর হাত থেকে কুৎসিত দর্শন রিভলভারটা খসে পড়েছে। পেছন ফিরে দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে–যেন নিষ্ঠুর বাস্তবকে অস্বীকার করতে চাইছে।

জেনসনের দেহ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। সামান্য একটা সীসের টুকরো ওর জীবনীশক্তি নিঃশেষে শুষে নিয়েছে। কার্ল জেনসন যে আর বেঁচে নেই এই কথাটা যেন আর বিশ্বাস করতে পারছি না।

লোলা হঠাৎ একটা চাপা আর্তনাদ করে অন্ধের মতো ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। কানে এলো শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করার শব্দ।

জেনসনের মৃতদেহের কাছেচুপচাপ বসে রইলাম। কি করব কিছু ভাবতে পারছি না। পুলিশে খবর দেওয়ার মতো বোকামির কাজ আমি কখনই করবো না, লোলা যদি বলে বসে জেনসনকে আমিই গুলি করেছি, আর আমার আসল পরিচয়টা জানিয়ে দেয়, তবে ওরা–আর কোনো প্রমাণ চাইবে না।

হঠাৎ বাইরে একটা গাড়ি এসে দাঁড়ানোর আওয়াজ পেলাম। তাড়াতাড়ি উঠে যেতে গিয়ে রিভলভারটা পায়ে ঠেকলো। শীঘ্র সেটা কুড়িয়ে পকেটে রাখলাম।বাংলো থেকে বেরিয়ে পাম্পের দিকে এগিয়ে চললাম।

বাইরে বের হতেই চোখে পড়লো একটা বিরাট সবুজ রঙের ক্রাইমলার পাম্পের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়ির আরোহী একজন মোটাসোটা বয়স্ক নোক ও তার সঙ্গিনী একটি অল্পবয়সী মেয়ে।

লোকটা আমাকে দেখেই হাজার রকমের কথা বলতে শুরু করে দিলো। বিশ লিটার পেট্রোল আর দুলিটার মোবিল, খাবার-দাবার ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে।

লোকটার একটা কথাও আমার কানে ঢুকলোনা। আচ্ছন্নের মতো যান্ত্রিকভাবে গাড়ির ট্যাঙ্কে তেল ঢালতে শুরু করলাম। তারপর অতি কষ্টে ওদের খেতে বসিয়ে বাইরে এলাম। ঠাণ্ডা হাওয়ায় বসে একটু ভাববার সময় পেলাম।

যেভাবেই ধরা যাক না কেন, আমার অবস্থা এখন কলে পড়া ইঁদুরের মতো। অবশ্য লোলারও একই অবস্থা। তরে জেনসনের মৃত্যুটাকে নেহাত আকস্মিক দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। লোলা হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে আসার সময় আচমকা ট্রিগার-এ চাপ পড়ে গুলি বেরিয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে এটি দুর্ঘটনা। কিন্তু পুলিশ কি তা স্বীকার করবে?

ওরা প্রশ্ন করবে লোলা রিভলবার নিয়ে অতো রাতে কি করছিলো? তখনই লোলাকে টাকার কথা বলতে হবে; আর তাহলেই একে একে সমস্ত কথাই বেরিয়ে পড়বে। লোলা

খুনের দায়ে জড়িয়ে পড়বে। তবে পুলিশের হাত থেকে রেহাই পেতে লোলা যে জেনসনের হত্যার দায়টা স্রেফ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমার ইচ্ছে করছিলো স্টেশন ওয়াগন নিয়ে এক্ষুনি পালিয়ে যাই। কিন্তু লোলা যদি পুলিশে জানিয়ে দেয়, তবে প্রথমেই ফোনের তার কাটতে হবে। তারপর ওর হাত পা বেঁধে রেখে কেটে পড়বো-কিন্তু না, তাতেও বিপদে আছে। হয়তো কোনো গাড়ির চালক তেল নিতে এসে কাউকে না দেখে বাংলোয় গিয়ে খোঁজ করতে পারে।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত চিন্তা মাথায় এলো। লোলা যদি আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দেয়, দিক না আমিও তাহলে পুলিশকে ঐ এক লাখ ডলারের কথা জানিয়ে দেবো। বলবো, ঐ টাকার কোনো আয়কর জেনসন দেয়নি। তাহলেই লোলার বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। আর লোলার যা টাকার লোভ সে কখনই এটা চাইবে না। এছাড়াও বন্ধ সিন্দুক খোলার জন্য এখন আমাকে লোলার প্রয়োজন হবে। কারণ সিন্দুকের কম্বিনেশনটা জেনসন ছাড়া আর কেউ জানে না।

আমি ঠিক করলাম এই প্যাঁচেই লোলাকে জব্দ করবো। কিন্তু জেনসনের মৃতদেহটার কি হবে? দেখেশুনে কোনো একটা জায়গায় পুঁতে ফেলবো। আর সেই সঙ্গে ওর অনুপস্থিতির জন্য একটা ভালোরকম গল্প ফাঁদলেই হবে। খদ্দেরদের শোনাতে হবে, না হলে ওরা সন্দেহ করবে।

আমি বাংলোর দিকে এগিয়ে গেলাম। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই দেখি লোলার হাতে টেলিফোনের রিসিভার-ও পুলিশে ফোন করছে।

আমাকে দেখেই ও থমকে গেলো। এর মধ্যেই লোলার চেহারা ভেঙে পড়েছে। শরীরের সমস্ত রক্ত কেউ যেন শুষে নিয়েছে। পাথরের চোখের মতো স্থির দৃষ্টিতে একজন আর একজনের দিকে চেয়ে রইলাম। মনে হলো যেন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী আসন্ন সঙ্কেতের অপেক্ষা করছে।

লোলার হাতে রিসিভার আর আমার হাতে ৪৫ রিভলবার ওরই দিকে তাক করা।

রিভলবারের দিকে চোখ পড়তেই লোলা চমকে উঠলো। মুহূর্তের জন্য ও হয়তো ভাবলল, আমি ওকে নৃশংসভাবে খুন করবো। ও কাঁপা কাঁপা হাতে রিসিভার নামিয়ে রাখলো।

আমি বললাম, শোবার ঘরে চলো, তোমার সঙ্গে কথা আছে। রিভলবার নামিয়ে ওকে এগোতে ইশারা করলাম।

শোবার ঘরে ঢুকে লোলা খাটের ওপর গিয়ে বসলো, ভয়ার্ত চোখে চেয়ে রইলো আমার হাতের রিভলবারের দিকে।

আমি লোলাকে বললাম, তুমি কোথায় ফোন করছিলে? পুলিশে? হয়তো ভেবেছ জেনসনকে খুন করার দায়টা আমার ঘাড়েই চাপিয়ে দেবে কি বলো? কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখেছো যে পুলিশে খবর দিলে তোমার অবস্থাটা কি হবে? ওরা যদি আমাকে এই খুনের দায়ে গ্রেপ্তার করে তবে ঐ টাকার কথা আমাকে বলে দিতে হবে। আর ওরা সমস্ত আয়কর হিসেব করে নেওয়ার পর তোমার কপালে কি থাকবে, একবার ভালো করে ভেবে দেখো।

লোলার চোখের দৃষ্টি দেখে বুঝলাম, আমার কথায় ও ভয় পেয়েছে। অতোগুলো টাকা হারাবার আশঙ্কায় ওর মনের ভেতর শুরু হয়ে গেছে সাইক্লোন।

এ ছাড়াও আর একটা উপায় আছে। তা হলো জেনসনের দেহটা লুকিয়ে ফেলতে হবে।রটিয়ে দিতে হবে ও জরুরী কাজে হঠাৎ বাইরে গেছে। তারপর যখন নিরাপদ মনে করবো তখন সিন্দুক খুলে দিয়ে আমি চলে যাবো আর তোমার টাকা তুমি পেয়ে যাবে। আমি আরও বললাম যে, তুমি যদি টাকা না চাও তবে পুলিশে ফোন করো, আমি বাধা দেবো না। আর যদি টাকা পেতে চাও তবে আমার কথায় তোমাকে রাজি হতে হবে।

আমি লোলার দিকে তাকিয়ে রইলাম। জানতাম এত কিছুর পর ও কখনো পুলিশে খবর দেবে না। তবুও আমি রিভলবার হাতে সতর্ক হয়ে রইলাম।

একসময় লোলা মুখ খুললো, টাকাগুলো এখনই দিয়ে দাও, আমি চলে যাচ্ছি। কথা দিচ্ছি, কাউকে তোমার কথা বলবো না।

না। আমি যখন ভালো মনে করবো তখনই তুমি টাকাগুলো পাবে, তার আগে নয়। আর যদি এটুকু ধৈর্য ধরতে না পারো তবে গিয়ে পুলিশকে খবর দাও।

এতোক্ষণে বোধহয় লোলা নিজের অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পারলো। বুঝতে পারলো একটা অদৃষ্ট ফাঁদ ওকে চারিদিক থেকে জড়িয়ে ধরেছে, যার হাত থেকে ওর আর মুক্তি নেই। ওর মুখের ওপর হতাশা, ক্ষোভ, ক্রোধ একসাথে ছড়িয়ে পড়লো। ও বিছানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়লো।

আমি লোলাকে কিছুক্ষণ সময় দেবার জন্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। আগে আঘাতটা সামলে উঠুক, তারপর দুজন মিলে জেনসনের মৃতদেহটার ব্যবস্থা করবো।

যখন আবার বাংলোয় ফিরে এলাম তখন রাত একটা বাজে। লক্ষ্য করলাম, লোলার ঘরে এখনও আলো জ্বলছে। ঘরের দরজায় পৌঁছে হাতল ঘোরাতেই বুঝলাম, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

লোলাকে ডাকলাম চীৎকার করে, কিন্তু লোলা দরজা খুললো না।

বুঝতে পারলাম, ও এখনও প্রকৃতিস্থ হয়নি। কিন্তু আর সময় নষ্ট করলে হবে না, তাই একাই বেরিয়ে পড়লাম।

মনে মনে ঠিক করলাম যে গুমটি ঘরেই জেনসন-এর দেহ কবর দেবো। তাহলে কেউ যে দেখে ফেলবে এমন সম্ভাবনা কম। একটা কোদাল আর একটা বেলচা নিয়ে গুমটি ঘরে গেলাম, কোণের দিকে, পুরোনো লোহা-লক্কড়ের স্তূপের পাশে একটা জায়গা দেখে খুঁড়তে শুরু করলাম

প্রায় সাড়ে তিনটের সময় আমার কাজ শেষ হলো। অতি কষ্টে জেনসন-এর দেহ কবর দিলাম। আমি কি করছিনা করছি লোলা একবারও দেখতে এলোনা। গর্ত ভরাট করে ওপরটা সমান করতে প্রায় একঘণ্টা লেগে গেলো। এরপর কাজ করার যে বড় ভারী টেবিলটা ছিলো, সেটাকে টেনে নিয়ে এসে রাখলাম জেনসনের কবরের ওপর। কারো

পক্ষে জানা তো দূরের কথা আন্দাজ করাও সম্ভব নয়, যে ওটার তলায়-মাটির চার ফুট নীচে জেনসন শুয়ে আছে।

গুমটি ঘরের আলো নিবিয়ে ঘরে ফিরে গেলাম, স্নান করে জামাকাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়লাম। এর মধ্যেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। আর আধঘণ্টার মধ্যেই পাহাড়ের ফাঁকে উঁকি দেবে সূর্য।

সকাল সাড়ে ছটার সময় ট্রপিকা স্প্রিংসে যাবার প্রথম ট্রাকটা এসে দাঁড়ালো।

ট্যাঙ্কে তেল ভরছি, ড্রাইভারটা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলো, মিঃ জেনসনকে যে দেখছি না?

আমি বুঝতেই পেরেছিলাম যে এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে পড়তে হবে। এখন থেকে দিনের পর দিন এই একই প্রশ্ন আমাকে শুনতে হবে।

মিঃ জেনসন এখানে নেই। অ্যারিজোনায় গেছেন, ওখানে আর একটা পেট্রল পাম্প খুলবেন, তাই জায়গা দেখতে গেছেন।

গত রাত্রে ভেবে ভেবে গল্পটা তৈরী করেছি। এর চেয়ে ভালো কিছু আর আমার মাথায় আসেনি।

লোকটা বেশ কৌতূহলী বলে মনে হলো। তাহলে এটা এখন কে দেখাশোনা করবে, তুমি? হ্যাঁ–একটু ইতস্ততঃ করে বললাম, আমি আর মিসেস জেনসন। লোকটা একটু

চমকে উঠলেও কিছু না বলে রেস্তোরাঁয় খাওয়া-দাওয়া সেরে, দাম মিটিয়ে ট্রাকে এসে উঠলো। তারপর তীক্ষ্ণ কান ফাটানো শব্দে শিস্ দিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে দিলো।

.

০৮.

ট্রাকটা চলে যাবার পর রান্নাঘরে যেতেই লোলার সঙ্গে দেখা হলো। মুখের মধ্যে কেমন যেন একটা অবসন্ন ভাব, চোখের কোলে কালি।

লোলার পরনে লাল প্যান্ট, গায়ে সাদা চোলি।ও আমার দিকে না তাকিয়েই প্রশ্ন করলোকার্লের কি করলে?

ওর দেহটা আমি পুঁতে ফেলেছি।–যাকগে শোনো–এখন থেকে আমরা দুজনে মিলেই এ জায়গাটা দেখাশোনা করবো। কিন্তু কেউ কারো ব্যাপারে নাক গলাবো না। যখন সময় হবে আমি চলে যাবো। যাবার আগে সিন্দুক খুলে দিয়ে যাবো।

লোলার চোখে ঝলক দিলো হায়েনার লোভাতুর দৃষ্টি, কিন্তু সেটা কবে? তাছাড়া কার্লের বন্ধুবান্ধব আছে তারা জানতে চাইবে কার্ল কোথায় গেছে!

সে সব আমার অনেক আগেই ভাবা হয়ে গেছে। তোমাকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবে সে অ্যারিজোনায় গেছে। মাস দুয়েকের আগে ফিরবে না। এই কমাস তুমিই এসব দেখাশোনা করবে, আর আমি তোমাকে সাহায্য করছি।

সে না হয় হলো। কিন্তু দুমাস পর কি হবে?কার্লকে তো ওরা আর ভুলবেনা; তখনও একই কথা বার বার জিজ্ঞেস করবে। কি উত্তর দেবো?

আমি লোলাকে বললাম, দুমাস পর তুমি কার্লের একটা চিঠি পাবে। তাতে লেখা থাকবে, সে ওখানে গিয়ে আর একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছে। এবং তাকে শীগগিরই বিয়ে করছে। এখানে সে আর ফিরবে না। তোমাকে যাতে খাওয়া পরার কষ্টে না পড়তে হয়, সেইজন্য এখানকার পেট্রল-পাম্পটা তোমাকে দিয়ে দিচ্ছে। এই দুঃসংবাদটা প্রত্যেকেই নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করবে। তারপর চারিদিক ঠাণ্ডা হলে আমিও কেটে পড়বো। তখন ইচ্ছে করলে এ জায়গাটা বেচে তুমি অন্য কোথাও চলে যেতে পারবে।

তার চেয়ে এক কাজ করো; কার্ল তোমাকে যে তিরিশ হাজার ডলার দিচ্ছিলো সে টাকাটা তুমি এখনই সিন্দুক খুলে নিয়ে নাও, তাহলে নু-ইয়র্কে পৌঁছে তোমার অসুবিধে হবেনা। তারপর বাকি টাকাটা

না। জেনসনের একটা টাকাও আমি ছোঁবো না। তাছাড়া এ জায়গাটা আমার পক্ষে বেশ নিরাপদ। আরো কিছুদিন না দেখে পালানোটা ঠিক হবে না।

হঠাৎ বাইরে একটা গাড়ির শব্দ পেলাম। তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে বের হতেই দেখি, একজন লম্বা, থলথলে চেহারার পুরুষ রেস্তোরাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে, চুলের রঙ সোনালী, গাঢ় নীল চোখ বয়স প্রায় চল্লিশ।

লোকটা সরাসরি প্রশ্ন করলো, জেনসন কোথায়?

আমি থতমত খেয়ে জবাব দিলাম, তিনি বেরিয়েছেন। কিছু প্রয়োজন থাকলে আমাকে বলতে পারেন।

আমাদের কথাবার্তা শুনে লোলা রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো। আগন্তুকের দিকে চোখ পড়তেই মিষ্টি হাসিতে ওর মুখ ভরে গেলো ও, মিঃ ল্যাশ! এতো সকাল সকাল যে–কি ব্যাপার?

লোলাকে দেখে সে টুপি খুলে অভিবাদন জানালো গুড মর্নিং, মিসেস জেনসন। ওয়ালেসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যাপারে কার্লের সঙ্গে কিছু কথা ছিল। ও বোধহয় আপনাকে বলেছে, আমাদের সভাপতি ওয়ালেস কাল রাতে হার্টফেল করে মারা গেছে। তার শোকসভায় কার্লেরই বক্তৃতা দেবার কথা। কিন্তু শুনলাম কাল এখানে নেই।

লোলা বললো একটু আগে এলেই কার্ল-এর সঙ্গে দেখা হতো। এই আধঘণ্টা হলো ও ট্রপিকা স্প্রিংসে রওনা হয়েছে।

ল্যাশ অবাক হয়ে তাকালো, অসম্ভব! এই তো ঢুকবার সময় দেখলাম, ওর গাড়িটা গ্যারেজেই রয়েছে, তাহলে

দেখলাম মিথ্যে কথা বলার জুড়ি নেই লোলার। ল্যাশের কথায়ু ওর মুখের ভাবে এতোটুকু পরিবর্তন হলোনা। ঠিকই দেখেছেন মিঃ ল্যাশ। কার্ল বলে গেছে, ফিরতে ওর মাস দুয়েক লাগবে। এতোদিন গাড়ি ছাড়া আমার অসুবিধে হবে ভেবে গাড়িটা আর নিয়ে যায়নি। অ্যাডাম ওকে তার ট্রাকে করে ট্রপিকা স্প্রিংসে নিয়ে গেছে।

ল্যাশ চোয়ালে হাত বোলাতে লাগলো। বুঝতে পারলাম, সে ভীষণ অবাক হয়ে গেছে। কালের হুট করে উধাও হয়ে যাওয়াটা তার কাছে ভালো ঠেকছে না।

একটা ক্ষীণ সন্দেহ যে ল্যাশের মনে উঁকি মারছে বেশ বুঝতে পারলাম। কেন গেছে কিছু জানেন?

গত রাতে মিটিং থেকে ফেরার পর কার্লের একটা ফোন আসে। কে যেন খবর দেয় অ্যারিজোনায় একটা পেট্রল পাম্প নাকি জলের দামে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। ব্যস, ওই খবর পেয়েই ও সাত সবাইকেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছে। কাউকে জানাবার আর সময় পায়নি।

লোলার উত্তরে ল্যাশ যেন কিছুটা অপ্রস্তুত হলো, মানে-ব্যাপার কি জানেন আমি ভাবতেই পারিনি, কার্ল এমনি না বলে হঠাৎ করে চলে যাবে।

ল্যাশ চলে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো, ঘুরে তাকালে আমার দিকে, একে তো চিনলাম না, মিসেস জেনসন?

ওর নাম জ্যাক প্যাটমোর আমাদের এখানে নতুন চাকরিতে ঢুকেছে; কালই ওকে এনেছে।

ল্যাশের চাউনি দেখে মনে হলো আমাকে তার একটুও পছন্দ হয়নি।ল্যাশ চলে যেতেই লোলা রান্নাঘরে ফিরে গেলো। এতোক্ষণে সাহস ফিরে পেলাম। জেনসনের অ্যারিজোনায় যাওয়ার গল্পটা ল্যাশ যখন বিশ্বাস করেছে, অন্য লোকেও করবে। তবে একথা নিশ্চিত

যে লোলাকে জড়িয়ে আমাকে নিয়ে অনেক কথা উঠবে। অতএব সাবধানে থাকাই ভালো।

আজ রবিবার। অত্যাধিক কাজের চাপ। সারা দিনে লোলা আমার সঙ্গে একটাও কথা বলেনি। রাত বারোটার সময় আমি কাজের হাত থেকে রেহাই পেলাম। একটু ফুরসত হওয়ায় গেলাম রান্নাঘরে।

গিয়ে দেখি কাজ শেষ হয়ে যাওয়ায় লোলা ওর গাউনটা খুলতে শুরু করেছে। আমাকে দেখেই ও থমকালো। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। আবার সে গাউন খোলায় মন দিলো।

হঠাৎ যেন একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম,শরীরে বিদ্যুতের স্রোত বয়ে গেলো।বুকের মধ্যে লকলক করে জ্বলে উঠলো কামনার লেলিহান শিখা। অসীম প্রচেষ্টায় নিজেকে সংযত করলাম।

লোলা গাউনটা খুলে একটা বাক্সে রাখলো। তারপর রান্নাঘরের খিড়কি দরজা খুলে বেরিয়ে গেলো।

আমি আলো নিভিয়ে ঘরে ফিরে এলাম। শোবার আগে জানলা বন্ধ করতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম।

লোলার শোবার ঘরের জানলা হাট করে খোলা। ঘরে আলো জ্বলছে, শুধু তাই নয়, লোলা দাঁড়িয়ে রয়েছে আলোর ঠিক নীচেই, পরনের চোলিটা ওর বাঁহাতে ঝুলছে। একটু

পরেই ও ঝুঁকে পড়ে প্যান্টটা মেঝে থেকে তুলে নিলো। বোধহয় প্রয়োজনের একটু বেশিই অপেক্ষা করলো। তারপর লঘু ছন্দে এগিয়ে চললো বাথরুমের দিকে

অবশ হাতকে আপ্রাণ চেষ্টায় জানলা বন্ধ করতে বাধ্য করলাম।

এইভাবেই দিন যায়। সারাদিন লোলার রান্নাঘরেই কাটে। আমার দিকে একবার তাকানো তো দূরের কথা একটা কথাও বলে না। রাতের নিয়মেরও কোনো হেরফের হয় না।

রাত এগারোটা বাজলেই লোলা বাংলোয় ফিরে যায়। ওর শোবার ঘরের জানলা এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধ হয় না। এই চুড়ান্ত প্রলোভন এড়াবার জন্য ওই সময়টা রেস্তোরাঁ ছেড়ে একেবারে বের হইনা। যখন দেখি বাংলোর আলো নিভে গেছে তখন শুতে যাই। কিন্তু শয়নে-স্বপনে জাগরণে চোখের সামনে যদি একই ছবি ভাসতে থাকে–ঘুমোবো কখন?

এইভাবে চারদিন কেটে গেলো। গরমটা যেন হঠাৎকরে বেড়ে গেছে। উত্তপ্ত মরুভূমির হাওয়া অসহ্য হয়ে উঠলো। ট্রাক গাড়ির চলাচলও কমে আসতে লাগলো। স্বাভাবিক ভাবেই কাজের চাপ একেবারে কমে আসতে লাগলো।

জেনসন মারা যাবার আটদিন পর লোলা গাড়ি নিয়ে ওয়েন্টওয়ার্থে গেলো।

একদিন আমি কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম গুমটি ঘরের দরজায় একটা মানুষের ছায়া। মুখ তুলে তাকাতেই পায়ের নীচে মাটি যেন দুলে উঠলো।

দরজায় দাঁড়িয়ে জর্জ রিক্স। আসন্ন বিপদের জন্য মনে মনে সতর্ক হলাম। রিক্সের পরণে সেই একই নোংরা জামাকাপড়।

গুড মর্নিং, আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, কার্ল কোথায়?

ঘর্মাক্ত হাত দুটো মুছতে মুছতে আমি উত্তর দিলাম, মিঃ জেনসন এখানে নেই, বাইরে গেছেন। ক চাই আপনার?

শোন ছোকরা বেশীফরফর কোরোনা। আমার দরকার আমি বুঝবো। তুমি এখানে চাকরি করো বলেই তো জানতাম। নাকি হঠাৎ মালিক হয়ে বসেছো?

আমি তো তা বলিনি। আপনার কি দরকার, তা জানতে চেয়েছি।

কার্ল কোথায় গেছে?

ব্যবসার ব্যাপারে অ্যারিজোনায় গেছেন।

কবে ফিরবে?

ঠিক জানিনা। হয়তো মাস দুয়েক লাগবে।

কার্লের ঠিকানাটা আমাকে দাও। আমার পেনসনের কাগজে সই দরকার। সব সময় কালই ওটা সই করে। তাই ওর সই না হলে পেনসনের টাকা পাওয়া যাবে না।

আমি বললাম যে, আমার কিছুই করার নেই। ঠিকানা জানা থাকলে আমি দিয়েই দিতাম। একবারের বেশী দু-বার বলতে হতো না। মিঃ জেনসন না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।

রিক্স টুপি খুলে মাথায় হাত বোলালো। চোখের মণি অচল, অনড়। তার মানে দুমাস অপেক্ষা করতে হবে?–তা এতদিন চলবে কি করে?

রিক্স দাঁত কিড়মিড় করতে করতে হঠাৎ চোখ তুলে তাকালো, মনে করো যদি সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটে যায়? যদি লোলা অসুস্থ হয়ে পড়ে? ধরো এই পেট্রল পাম্পে আগুন লেগে যায়? তখন কার্লকে তো অবশ্যই একটা খবর দেবে। জরুরী প্রয়োজনে খবর দেওয়ার জন্য কার্ল নিশ্চয়ই একটা ঠিকানা দিয়ে গেছে?

না। মিসেস জেনসনও অসুস্থ হচ্ছে না, আর এখানে আগুন লাগছে না। অতএব ভালোয় ভালোয় কেটে পড়ো। আমার কাজ আছে।

এরপর স্টেশন ওয়াগানটার কাছে ফিরে গিয়ে ডিস্ট্রিবিউটর হেডটা আটকে বনেট বন্ধ করে দিলাম।

মিসেস জেনসন কখন ফিরবে?

বলতে পারছি না–তবে মনে হয় দেরী হবে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর অবশেষে রিক্সের ভাঙা স্বর কানে এলৈ।

আমাকে কুড়িটা ডলার ধার দিতে পারবে?

টাকা তো আমার নয় যে ইচ্ছামতো ধার দেবো। যাও আর বিরক্ত করো না।

কিন্তু রিক্সের যাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না। একটু চুপ করে থেকে ও বললো, ভাবছি ম্যারিজোনা পুলিশকে খবর দেবো। ওরা হয়তো কার্লের ঠিকানা খুঁজে বার করতে পারবে।

একটা শক্ত নাট আপ্রাণ শক্তিতে খোলার চেষ্টা করছিলাম। রেঞ্চটা নাটের গা থেকে পিছলে যেতেই সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। রিক্স বলে কি!

ও কিন্তু কথাগুলো অত্যন্ত সাধারণ ভাবেই বলেছে। হয়তো তেমন কিছু ভেবে বলেনি। কিন্তু পুলিশ যদি রিক্সের কথায় সত্যি সত্যি জেনসনের খোঁজ শুরু করে তাহলেই বিপদ। মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করতে লাগলো। সবকিছু তালগোল পাকিয়ে গেলো।

গলার স্বর যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রেখে বললাম, তাই করো। পুলিশ দিয়ে খোঁজ করাচ্ছো শুনলে হয়তো মিঃ জেনসন বেশী খুশী হবেন– হয়তো তোমার কাগজে একটার জায়গায় দুটো সই করে দেবেন।

তা কি আর করা যাবে! তুমি যখন কার্লের ঠিকানা জানোই না তখন এছাড়া আর উপায় কি! কার্ল যা খুশী ভাবে ভাবুক, ওর সই আমাকে পেতেই হবে। তবে আমার কি মনে হয় জানো? লোলা হয়তো জানে। তোমার কাছে চেপে গেছে। লোলা ফিরে এলে ওকে

বোলো। শেষ পর্যন্ত ও যদি ঠিকানা না দেয় তবে বাধ্য হয়ে অ্যারিজোনা পুলিশকে জানাবো। কার্লকে খুঁজে বের করতে ওদের বেশী সময় লাগবে না।

এবার রিক্সের দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললাম, ঠিক আছে লোলা ফিরলে আমি অবশ্যই তাকে বলবো। আমি যতদূর জানি–ঠিকানা মিসেস জেনসন জানেন না,তবু একবার জিজ্ঞেস করবো।

রিক্সের মতো লোককে একথা বলা মানে হার স্বীকার করে নেওয়া। কিন্তু কি আর করা যাবে? কোনো পুলিশ অফিসার এখানে এসে জেনসনের খোঁজ করবে, একথা ভাবাই যায় না।

রিক্স যাবার আগে বলে গেলো যে কাল রাতে সে আবার আসবে। আর আমি যেন ঠিকানাটা জোগাড় করে রাখি।

রিক্স চলে যাবার পর নিজেকে বড়ো ক্লান্ত মনে হলো। তাড়াতাড়ি চাকাটা সারিয়ে রেস্তোরাঁয় গেলাম।একটা গ্লাসে কিছুটা হুইস্কি ঢেলে চুমুক দিলাম। রিক্সের কথাগুলো মাথার মধ্যে ঘোরাফেরা করতে লাগলো। হুইস্কি শেষ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি করতে লাগলাম।

অ্যারিজোনা পুলিশ কি রিক্সের চিঠির কোনো গুরুত্ব দেবে? হয়তো দেবে না। কিন্তু ও যদি বলে দেয় যে, জেনসন উধাও, আর তার স্ত্রী ওর কর্মচারীর সঙ্গে রাত কাটাচ্ছে, তাহলে? অনেক সময় এরকম সামান্য খবর পেয়েই পুলিশ তদন্ত শুরু করে দেয়। ওরা যদি জেনসনকে অ্যারিজোনায় খুঁজে না পায় তবে নির্ঘাত এখানে লোক পাঠাবে।

আমি ভাবতে লাগলাম যে, যেমন করেই হোক রিক্সের মুখ বন্ধ করতেই হবে। এবং তার একমাত্র পথ হলো ওকে টাকা দেওয়া। এভাবে টাকা দিয়ে হয়তো ওকে মাস দুয়েক ঠেকিয়ে রাখা যাবে। তারপর? জেনসন যে অন্য একটা মেয়েকে নিয়ে ভেঙ্গে পড়েছে সে কথা কি বিশ্বাস করবে? রিক্স যে রকম স্বভাবের লোক তাতে নিঃসন্দেহে চিঠিটা দেখতে চাইবে। কিন্তু চিঠিটা জাল বলে কি বুঝতে পারবে? মনে হয় চিনে ফেলার সম্ভাবনাই বেশী। কারণ ওর পেনসনের কাগজে সব সময় জেনসনই সই করতো। সুতরাং ও সহজেই বুঝতে পারবে চিঠিটা জেনসনের লেখা নয়। তারপর?

যতই ভাবতে লাগলাম পরিস্থিতি ততই জটিল মনে হতে লাগলো। রিক্সের মতো প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে বুঝে শুনে প্রতিটি পা ফেলা উচিত। হঠাৎ করে সাময়িক উত্তেজনার বসে কিছু একটা করে বসা ঠিক নয়। ভাবলাম লোলা ফিরে এলে ওর সঙ্গে একটা আলোচনা করা প্রয়োজন।

রাত দশটায় লোলা ফিরলো। লোলার গাড়ির শব্দে বাইরে এলাম। দেখলাম

লোলা গাড়ি থেকে নেমেই হনহন করে বাংলোর দিকে হেঁটে গেলো। ছুটে ওর পাশে গিয়ে হাজির হলাম, তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে।

কোনো গুরুত্ব না দিয়ে ও দরজা খুলে বাংলোয় ঢুকে পড়লো। পিছন পিছন আমিও ঢুকলাম। ওকে বললাম তোমার পেয়ারের দোস্ত,রিক্স আজ সকালে এখানে এসেছিলো।

লোলার সবুজ চোখ জোড়ায় যেন আগুন ঠিকরে বের হলো। ও ভীষণ ভাবে চমকে উঠলো। ওর মুখের রেখা কঠিন হলো। রাগের বদলে ফুটে উঠলে এক সতর্ক ভাব। আমি নির্বিকার ভাবে বসবার ঘরে গিয়ে একটা চেয়ারে বসলাম। লক্ষ্য করলাম, কার্পেটের ওপর যে রক্তের দাগ ছিল সেটা লোলা পরিষ্কার করে ফেলেছে। চোখ তুলে দেখি ও দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

আমি বললাম, রিঙ্গ, মিঃ জেনসনের খোঁজ করছিলো। ওর পেনসনের কাগজে তার সই দরকার–তাই কার্লের ঠিকানা চাইছিলো।

লোলা নির্বিকারযেন শুনতে হয় তাই শুনছে।

ঠিকানা জানিনা বলার পর ও বলছে, অ্যারিজোনা পুলিশকে জেনসনের খোঁজ করতে বলবে। কারণ তার সই না হলে রিক্স পেনসনের টাকা পাবে না।

লোলাকে একটু চিন্তিত দেখালো। ও দরজা বন্ধ করে আমার মুখোমুখি একটা চেয়ারে এসে বসলো। আমি জানালাম যে রিক্স কাল রাতে আবার আসবে বলেছে। এর মধ্যেই আমাদের ভেবে ঠিক করতে হবে যে রিক্সকে নিয়ে কি করা যায়, যেহেতু রিক্স আমাদের দুজনেরই শত্রু।

লোলা শান্তভাবে একটা সিগারেট ধরালো, এতে ভাববার কি আছে? সিন্দুকটা খুলে তোমার টাকা নিয়ে তুমি ভেগে পড়ো, বাকী টাকাটা নিয়ে আমিও কেটে পড়বো। রিক্স এসে দেখবে, আমরা কেউ নেই।

আমি অধৈর্য হয়ে বললাম, কিন্তু ভেবে দেখেছো কি কোনো লোক পেট্রল নিতে এসে যদি দেখে জায়গাটা খালি তবে কি হবে? রিক্স যখন দেখবে আমরা কেউ নেই তখন ও অবশ্যই পুলিশে খবর দেবে। আর তখনই আমাদের পেছনে ফেউ লাগবে।

জায়গাটা যে বিক্রী করে দেবে তারও কোনো উপায় নেই। কেননা তোমাকে প্রমাণ করতে হবে যে জেনসন মৃত এবং সে উইল করে জায়গাটা তোমাকে দিয়ে গেছে। তখন আর জানতে কারো বাকি থাকবে না যে কার্লকে তুমি খুন করেছ।

লোলার মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারলাম যে ও হাড়ে হাড়ে অনুভব করছে যে, কি ফাঁদে আমরা জড়িয়ে পড়েছি। লোলার দুহাতের চেটো চেয়ারের হাতল দুটোকে নিষ্ফল আক্রোশে নিষ্পেষিত করতে লাগলো।

তুমি এখানে থাকো, আর সিন্দুক খুলে আমার টাকা আমাকে দিয়ে দাও–আমি চলে যাবো। কেউ জানতে চাইলে বলবে যে আমি অ্যারিজোনায় কার্ল-এর কাছে গেছি না ফেরা পর্যন্ত এই পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন-এর দায়িত্ব তোমার ওপরেই আছে।

তুমি কি ভেবেছো রিক্সের মতো লোক সে কথা বিশ্বাস করবে? প্রথমে জেনসন উধাও হলো তারপর তুমি–পেট্রল পাম্পে আমি একা। ও সোজা পুলিশকে গিয়ে বলবে, আমি তোমাদের দুজনকে খুন করে এখানকার মালিক হয়ে বসেছি। রিক্সের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস না করলেও ওরা তদন্ত করতে এখানে আসবেই। তারপর হয়তো জানতে পারবে আমার পরিচয়-খুঁজে পাবে জেনসনের মৃতদেহ।

লোলা ভয় পেয়ে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো, কি? তুমি কার্লকে এখানে কবর দিয়েছো? পাগলামোর একটা সীমা থাকা দরকার।

আমি বললাম, আমার এ ছাড়া আর কোনো পথ ছিলো না। তাছাড়া কোথায় বা কবর দেবো? তুমি কি আমাকে সাহায্য করেছিলে? ভেবেছিলে তিনমনী লাশটাকে আমি একা স্টেশন ওয়াগনে তুলে নিয়ে যাবো। চমৎকার! কার্লকে আমি গুমটি ঘরে পুতে ফেলেছি। পুলিশ যদি রিক্সের কথায় এখানে এসে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করে দেয় তবে নির্ঘাত ওর দেহ খুঁজে পাবে।

লোলা তীক্ষ্ণ স্বরে চীৎকার করে উঠলো, তার মানে? তোমার সঙ্গে আমাকে এখানে চিরদিন থাকতে হবে?

চিরদিন কিনা জানিনা, তবে থাকতে হবে। এছাড়া আমাদের আর কোনো পথ নেই।

অনেক সহ্য করেছি, আর নয়, তুমি থাকলে থাকো। আমি এখানে এক মুহূর্তও থাকছি না, এক্ষুনি আমার টাকা আমাকে দিয়ে দাও।

হাত বাড়িয়ে সিন্দুকটা দেখালাম, তাহলে যাও, আর দেরী করছো কেন? সিন্দুক খুলে টাকা নিয়ে চলে যাও! তবে আমার কথাগুলো আর একটু ভেবে দেখো, তাহলেই বুঝতে পারবে, এ ছাড়া আমাদের আর পথ নেই।

বাংলো ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। লোলা চেয়ারেই বসে রইলো, চোখে আতঙ্ক আর ঘৃণা নিয়ে। রিক্সের চিন্তাকে কিছুতেই মন থেকে দূর করতে পারলাম না। রাত বারোটা পর্যন্ত

পাম্পের কাছে বসে রইলাম। চেয়ে দেখলাম বাংলোর আলোও জ্বলছে, অর্থাৎ লোলার মনেও একই ভাবনা।

অবশেষে চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেতে ঘরে ফিরে হাত মুখ ধুয়ে, জামা কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু বুঝলাম ঘুমোবার চেষ্টা নিরর্থক।

হঠাৎ ঘরের দরজা খোলার মৃদু শব্দে চমকে উঠলাম। রিক্সের চিন্তা মন থেকে মিলিয়ে গেলো। কাঠ হয়ে শুয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকলাম

ঘরের মধ্যে ঢুকলে এক ছায়ামূর্তি। জানলা দিয়ে ঠিকরে পড়া চাঁদের আলোয় তাকে চিনতে। আমার ভুল হলো না। সে হলো ভোলা।

ওর গায়ে সবুজ সিল্কের চাদর। চাঁদের রুপোলী আলো সেটার গায়ে পড়ে পিছলে যাচ্ছে। লোলা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে আমার পাশে বসলো। ওর চাপা ফিসফিস স্বর কানে এলো, শেট যদি আমাদের একসঙ্গেই থাকতে হয় তবে আর মিছিমিছি শত্রুতা করে লাভ কি?

-ও আমার দেহের ওপর ঝুঁকে এলো–আমার মুখের ওপর নামিয়ে আনলো ওর মুখ-ওর তৃষ্ণার্ত ঠোঁট ডুবিয়ে দিলো আমার ঠোঁটে

সকালের সোনা রোদ

.

০৯.

সকালের সোনা রোদ সরাসরি চোখে এসে পড়তেই ঘুম ভাঙলো। শরীরে এক বিচিত্র অবসাদ। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম ছটা বেজে কুড়ি মিনিট। লোলা যে কখন চলে গেছে জানিনা, কিন্তু ওর সেন্টের নেশা ধরানো মিষ্টি গন্ধ এখনও বিছানায় মিশে রয়েছে।

বিছানা ছেড়ে বাথরুমে গেলাম। দাড়ি কামিয়ে, স্নান সেরে জামাকাপড় পরে নিলাম। আজ সকালে লোলার মনোভাব কি রকম আছে জানার জন্য আর দেরী না করে রেস্তোরাঁর দিকে পা বাড়ালাম।

রান্নাঘরের ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়লো কর্মরত লোলাকে। ও কাজ করার সাদা গাউনটা পরে ডিমের ওমলেট করতে ব্যস্ত। পায়ের শব্দে ও ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো, ও হুজুরের ঘুম তাহলে ভেঙেছে! আমি তো ভাবছিলাম, আজ সারাটা দিন বুঝি পড়ে পড়ে ঘুমোবে!

ধীরে ধীরে ওর পেছনে এসে ওকে জড়িয়ে ধরলাম, কাছে টেনে নিলাম, মুখ ডুবিয়ে দিলাম ওর আগুন রঙা চুলের বন্যায়।

লোলা মুখ সরিয়ে নেবার জন্য একটুও ব্যস্ত হলো না। বরং নিজেকে এলিয়ে দিলো আমার গায়ে, কাল রাতের জন্য তুমি নিশ্চয়ই আমার ওপর রাগ করেছে?

ওকে কাঁধ ধরে ঘুরিয়ে আমার মুখোমুখি দাঁড় করালাম, হেসে বললাম, তাহলে আরো একবার আমাকে রাগ করতে দাও।

এক ঝটকায় ওকে আমার বুকে টেনে নিলাম, ঠোঁট নামিয়ে আনলাম ওর ঠোঁটের ওপর। অনুভব করলাম ওর হৃৎস্পন্দন, ওর যৌবনের উষ্ণস্পর্শ। লোলার আঙুল খেলা করে বেড়াতে লাগলো আমার চুলে

একসময় আমার বাঁধন ছাড়িয়ে ও প্রাতঃরাশের আয়োজন করতে লাগলো। একটা চেয়ারে বসে লক্ষ্য করছিলাম ওকে। কি রকম সুপটু হাতে ও একটার পর একটা কাজ করে চলেছে।

প্রাতঃরাশ তৈরী শেষ করে লোলা খাবারের প্লেটটা আমার দিকে এগিয়ে দিলো। তারপর আমার মুখোমুখি বসে একটা সিগারেট ধরালো। ওর চোখের দৃষ্টি আজ আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত–সম্পূর্ণ নতুন।

শেট, প্রথম থেকেই তোমার সঙ্গে আমি খারাপ ব্যবহার করেছি। কিন্তু কাল রাতেই আমার মত পরিবর্তন হয়েছে। ভেবে দেখলাম, কার্ল মারা যাবার পর আমরা যেভাবে এতোদিন কাটিয়েছি তার কোনো অর্থ হয় না; বিশেষতঃ–তুমি, যখন একজন সুপুরুষ আর-কোনো মেয়ের জীবনে তোমার মতো পুরুষের সঙ্গলাভনিঃসন্দেহে একটা

অভিজ্ঞতা। তুমি বরং তোমার জিনিসপত্র নিয়ে বাংলোয় চলে এসো–এখন আর আলাদা থেকে লাভ কি?

ঠিকই বলেছো–তুমি তো জানো, প্রথমদিন থেকেই তুমি আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। তাছাড়া গত রাতের পর আলাদা থাকা কি আমার সাধ্যে কুলোবে? লোলা মিষ্টি হেসে লজ্জায় মুখ নামালো।

বাইরে থেকে ট্রাকের শব্দ ভেসে এলো। লোলা রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

খাওয়া শেষ হতেই আমার মন সক্রিয় হয়ে উঠলো। লোলা অভিনয় করছেনা তো! কে বলতে পারে ক্রুর সাপিনীর এ এক নতুন অভিসন্ধি।

কিন্তু অবচেতন মনে একটা ক্ষীণ আশা উঁকি মারছিলোর হয়তো ও সত্যিই আমাকে ভালোবাসে।

লোলা রান্নাঘরে ফিরে এলো। চোখে মুখে সামান্য পরিশ্রান্ত ভাব, কিন্তু ঠোঁটে মোহিনী হাসি। ও আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। আলতো করে ওকে জড়িয়ে ধরলাম, রিক্সের কথা কিছু ভেবেছো? ও তো রাত্রিতে আবার আসবে–

ওর জন্যে আমি একটুও ভাবছি না। কিছু টাকা দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে–ও আর আসবে না। রিক্সকে সামলানোর ভার আমার।

গত কয়েকদিনের অসহ্য আবহাওয়া বর্তমানে অনেকটা সহনীয় হয়ে উঠেছে। মরুভূমির হাওয়ায় আগের মতোই অনুভূত হচ্ছে শীতল আমেজ। পয়েন্ট অফ নো রিটার্নআবার কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে।

সারাদিনের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও,দুএক মুহূর্তের অবসরে রান্নাঘরে গিয়ে লোলার উষ্ণ সান্নিধ্য অনুভব করছি। প্রতিবারই ওকে আগের চেয়েও বেশী আকর্ষণীয় বলে মনে হয়েছে। কাজের মাঝে ওকে ব্যস্ত করার জন্য অনেক কপট অনুযোগ শুনতে হয়েছে। কিন্তু কোনবারই আমাকে ও ফিরিয়ে দেয়নি। তবুও কেন জানিনা, ও যে অভিনয় করছে, এ ধারণাটা আমার মনে আরও বদ্ধমূল হয়েছে।

সন্ধ্যে সাতটার সময় যানবাহন চলাচল একেবারে কমে এলো। সুতরাং একটুও সময় নষ্ট না করে রান্নাঘরে গেলাম।

লোলা আমাকে দেখেই বললো, কি চাই?

কোনো জবাব না দিয়ে ওকে আমার বুকের মধ্যে টেনে নিলাম, ও আমার বাঁধন ছাড়িয়ে মুক্ত, হবার চেষ্টা করলেও পেরে উঠলো না। যেন একটা তুলতুলে নরম পালকে ঢাকা পাখি তার ছোট্ট ডানা ঝটপট করছে।

আমি ওকে জাপটে ধরে রইলাম। দেখি তুমি কেমন করে ছাড়াও আমাদের এই একান্ত ব্যস্ততার মুহূর্তে একটা হাল্কা শব্দ কানে এলো, রান্নাঘরের দরজা খোলার শব্দ।

চমকে উঠে এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়ালাম। কিন্তু ততোক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে।

আমরা দুজনেই দরজার দিকে তাকিয়ে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে রিক্স। ও হাসছে, কুৎসিত মুখের চেহারা হয়ে উঠেছে। ভয়ালকুটিল।

আমাদের আর বুঝতে বাকি রইলো না যে ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবই লক্ষ্য করেছে। আমরা জানতাম রিক্স ঠিক এই সময়েই আসবে তবুও জেনেশুনেও কি বোকার মতো কাজ করেছি।

লোলার দিকে চেয়ে দেখলাম ও কিন্তু এতোটুকু বিচলিত হয়নি। মুখ ভাবলেশহীন চোখের ভাষায় এক নীরব প্রশ্ন।

মনের অপরাধবোধ সম্ভবতঃ প্রতিফলিত হয়েছিলো আমার মুখের দর্পণে। কারণ রিক্স কৌতূহলভরে একবার আমাকে দেখলে তারপর লোলার দিকে ফিরে তাকালো, তোমাদের বিরক্ত করার কোনো উদ্দেশ্য আমার ছিলো না। বলেছিলাম এই সময়ে আসবো তাই এসেছি।

মনে হলো আমার ঠোঁট দুটো কেউ যেন সেলাই করে দিয়েছে।চুপচাপদাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছি।

লোলা স্বাভাবিক ভাবে জিজ্ঞেস করলো, এ সময়ে কি দরকার জর্জ?

রিক্সের ক্ষুদে চোখজোড়া আমাদের মুখের ওপর ঘুরে বেড়াতে লাগলো। আমি যে এ সময়ে এখানে আসবো বলেনি ও? আঙুল দিয়ে আমাকে দেখালো।

লোলা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

কার্লের কোনো খবর পেয়েছো? আমার পেনসনের কাগজে ওর সই প্রয়োজন।

না এখনও পাইনি। হয়তো ওখানে গিয়ে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তুমি তো এক কাজ করতে পারো; কোনো উকিল বা ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে দিয়ে তোমার কাগজে সই করাতে পারো।

রিক্স বললো, তা সম্ভব নয় কেননা কার্লেরসইনা হলে ওরা টাকা আটকে দেবে। আমার তাহলে চলবে কি করে?

লোলা কাধ বাঁকালো, কি আর করা যাবে, কার্ল তো নির্দিষ্ট কোনো ঠিকানা দিয়ে যায়নি। ও না ফেরা পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতেই হবে।

লোলার নির্বিকার দৃষ্টির কাছে রিক্স যেন অস্বস্তি বোধ করলো। যে কথাগুলো বলবে সেগুলো হয়তো মনে মনে একবার ভেবে নিলো।

রিক্স বললো, তাহলে অ্যারিজোনা পুলিশকে লিখে জানানোই ভালো। কারণ পেনসনের কাগজে কার্লের সই না হলে আমার চলবে না।

লোলা জানালো যে, ইচ্ছে হলে তাই করো, তাতে আমার কিছু যাবে আসবে না। তবে কার্ল অ্যারিজোনায় হয়তো না-ও থাকতে পারে। একবার কোলোরাজে যাবে বলেছিলো।– তা এ নিয়ে এতো ঝামেলা করবার কি আছে, জর্জ? আমার মনে হয় কোনো ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে দিলেই সে সই করে দেবে।

–অবশ্য যদি তোমার টাকার খুব প্রয়োজন থাকে তোবলো দু-পাঁচ ডলার না হয় ধারই দেওয়া যাবে।

লোলা এতো সহজ আর স্বাভাবিক ভাবে ধারের প্রসঙ্গ তোলায়, রিক্স সন্দেহ করার কোনো সুযোগ পেলো না।

লোলা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেলো একটু পরেই ফিরে এলো হাতে তিনটে পাঁচ ডলার এর নোট নিয়ে। লোলা তিনটে নোট নিয়ে রিক্সের হাতে গুঁজে দিলো, নাও, ধরো। এই শেষ, এর চেয়ে বেশী আমার কাছ থেকে আর পাবে না, অতএব, শুধু শুধু আর এসো না। তোমাকে টাকা দিয়েছি শুনলে কার্ল হয়তো রাগ করবে।

রিক্স তাড়াতাড়ি টাকাগুলো পকেটে ভরে ফেললল, লোলা, তুমি বড় নির্দয়। ও দাঁত বের করে হাসলো, আমি যে তোমার স্বামী দেবতা নই, সেজন্য নিজেকে বড় ভাগ্যবান মনে করি।

আমি আশা করি কয়েকদিনের মধ্যেই কার্ল ওর ভুল বুঝতে পারবে। তারপর চোখের জলে বুক ভাসাবে, রিক্স শেয়ালের মতো খিক খিক করে হেসে উঠলো।

লোলা চীৎকার করে উঠলো, কার্লের ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না।

রিক্স ওর চোখ জোড়া আমার মুখের ওপর একবার বুলিয়ে নিলো। তারপর লোলার দিকে তাকিয়ে বললো, একটু সাবধানে থেকো। কার্ল হয়ত এতখানি বাড়াবাড়ি পছন্দ করবে না।

লোলা আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললো, একে এক লাথি মেরে বাইরে বের করে দাও, জ্যাক, অনেক সময় ধরে ওর বকবকানি সহ্য করেছি।

আমি রিক্সের দিকে এগিয়ে যেতেই ও ঘুরে দৌড় লাগালো। ওর গাড়ির শব্দ মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমরা চুপচাপ অপেক্ষা করে থাকলাম। তারপর লোলা টেবিলের কাছে গিয়ে আবার কাজে মন দিলো।

লোলা আমার দিকে তাকিয়ে বললো, তোমায় কিছু ভাবতে হবে না, রিক্সকে আমি সামলাবো।

একদিন দুদিন করে দুসপ্তাহ কেটে গেলো, রিক্স আর এলোনা। কিন্তু রিক্স না এলেও জেনসনের অনুপস্থিতির জন্য প্রায় একশো জন লোকের কাছে জবাবদিহি করতে হয়েছে। দু-একজন সামান্য সন্দেহ প্রকাশ করলেও, অ্যারিজোনায় যাওয়ার গল্পটা মোটামুটি সকলেই বিশ্বাস করেছে। কয়েক জন একটু অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে থেকেছে।

প্রতিদিন রাতে একটার সময় রেস্তোরাঁ বন্ধ করে আমি আর লোলা শুতে যাই বাংলোয়। মাঝে মধ্যে জেনসনের কথা ভেবে অস্বস্তি হয়। ওরই বিছানায় ওরই বৌকে নিয়ে শুয়ে আছি। কিন্তু লোলার দুনির্বার আকর্ষণের কাছে এসব চিন্তা ধুয়ে মুছে বিলীন হয়ে যায়। ওকে সোহাগে আদরে জড়িয়ে চুমোয় চুমোয় অস্থির করে তুলি। সমস্ত পৃথিবী কেন্দ্রীভূত হয় আমাদের একান্ত অস্তিত্বে

একসময় পূর্ণ পরিতৃপ্তির অবসাদ নিয়ে ক্লান্ত দেহে দুজনে পাশাপাশি শুয়ে থাকি। জানলা দিয়ে আসা চাঁদের আলোয় মায়াময় পরিবেশে আরো একবার মনে পড়ে কবরে শুয়ে থাকা জেনসনের কথা। তখন নিজেকে ভীষণ অপরাধী বলে মনে হয়। কিন্তু লোলাকে কখনই অপরাধ বোধের স্বীকার হতে দেখিনি। বরং ওকে দেখে মনে হয় কার্ল জেনসন নামে ব্যক্তিত্বপূর্ণ পুরুষটি ওর স্মৃতিভাণ্ডার থেকে একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে কার্ল-এর অস্তিত্ব ওর কাছে নেহাতই অবাস্তব।

তবে এই দুটো সপ্তাহে একটা জিনিসই উপলব্ধি করেছি যে, লোলাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি। যেভাবে আমরা দিনের পর দিন কাটিয়েছি, তাতে হয়তো এটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক। যদিও লোলাকে দেখার প্রথম দিন থেকেই অনুভব করেছিলাম ওর প্রতি অনিবার্য দুর্দম আকর্ষণ। কিন্তু এও মনে হয়েছিলো–সেটা নিতান্তই নারীর যৌবনের প্রতি পুরুষের যে চিরন্তন লিপ্সা, তারই তাৎক্ষণিক বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু এখন দেখছি তা নয়। কামনা-বাসনার শেষ পর্যায়ে পৌঁছেও আমাদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ এতোটুকুও কমেনি। বরং লোলাকে ঘিরে সুখীসংসারের সুখস্বপ্ন দেখি। তাছাড়া ওকে ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে ওর প্রতি আমার সন্দেহ সতর্ক ভাবটা অনিবার্যভাবে ক্রমশই ফিকে হয়ে এসেছে।

কখনো কখনো আচ্ছন্ন মনকে বিবেকের কষাঘাতে সচেতন করেছি। কিন্তু পরমুহূর্তেই ওর যৌবনের সাজানো ডালিতে নিজের সত্তাকে সমর্পণ করেছি।

লোলা কিন্তু একবারের জন্যও টাকার কথা তোলেনি। সিন্দুকের কথা যেন ও একেবারে ভুলেই গেছে। ওর প্রতি আমার বিশ্বাস অনেকটা বেড়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত মনে হয়েছে লোলাও আমাকে সমানভাবে ভালোবাসে।

একদিন এক মিষ্টি সকালে আমরা বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে আছি জানলা দিয়ে চোখে পড়ছে পাহাড়ের সারি, ভোরের সিঁদুর রাঙা সূর্য হঠাৎ লোলা প্রশ্ন করলো, আচ্ছা শেট, কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য একজন লোক রাখলে কেমন হয়? আমরা বেশ মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে ওয়েন্টওয়ার্থে বেড়াতে যেতে পারি

প্রস্তাবটা লোভনীয় হলেও বিপদজনক। আলস্যে আড়মোড়া ভেঙে ওর দিকে তাকালাম, তা হয় না লোলা। ওয়েন্টওয়ার্থে আমরা একসঙ্গে বেড়াতে গেলে, লোকে নানা ধরনের কথা বলবে।না, এখনও আমাদের মাস দুয়েক অপেক্ষা করতে হবে। জেনসন যে আর ফিরছে না, সে গল্পটা রটিয়ে দেওয়ার পর লোক রাখার কথা ভাবা যাবে।

লোলা আমার চোখে চোখ রেখে বললো, ঠিক আছে, তোমার কথাই থাক; আর কিছুদিন না হয় অপেক্ষাই করা যাবে। হঠাৎ কি মনে পড়ায় আবার বললো, শেট তুমি আজ ওয়েন্টওয়ার্থে যেতে পারবে। অনেক জিনিসপত্র কেনার আছে।

আচমকা এক সন্দেহের ঝাঁপটায় সচেতন হয়ে উঠলাম আমি। আমাকে সরানোর জন্য এটা কি লোলার কোনো নতুন মতলব? হয়তো আমাকে ওয়েন্টওয়ার্থে পাঠিয়ে ট্রপিকা স্প্রিংসে ফোন করে কোনো সিন্দুক সারানোর লোক ডেকে আনবে–তাকে দিয়ে সিন্দুক খোলাবে তারপর আমি ওয়েন্টওয়ার্থ থেকে ফিরতে ফিরতে টাকা নিয়ে হাওয়া হয়ে যাবে।

আমি লোলার দিকে ফিরে তাকালাম। ওর মুখে এক নির্বিকার ভাব। আমি ওকে বললাম বোধহয় ঠিক হবে না, লোলা। ওখানে গেলে বিপদের সম্ভাবনা আছে–কেউ আমাকে চিনে ফেলতে পারে। তার চেয়ে বরং তুমি যাও, আমি এদিকটা দেখাশোনা করবো। সেটাই মনে হয় নিরাপদ হবে।

লোলার মুখের ভাবে কোনো পরিবর্তন দেখলাম না। ও পায়ে পায়ে বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালো আমার দিকে তাকিয়ে বললো, শেট সত্যিই কি ওয়েন্টওয়ার্থে যাওয়া তোমার পক্ষে বিপজ্জনক হবে?

–তা জানিনা। তবে, আমি কোনো ঝুঁকি নিতে চাইছি না।

–তাহলে না যাওয়াই ভালো। তোমার ভালোমন্দ কিছু একটা হোক তা আমি চাইনা।

–শুনে সুখী হলাম।

–ঠাট্টা নয় শেট, সত্যি বলছি। তোমাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি।

আমি আনন্দ আর ধরে রাখতে পারলামনা। বিছানা থেকে নেমে ওকে জড়িয়ে ধরলাম, সত্যি? এতোদিন তোমার মুখ থেকে শুধু এই কথাটাই শুনতে চেয়েছি লোলা।

ও আমার বুকে আঙুল দিয়ে দাগ কাটছিলো, হেসে বললো, হ্যাঁ, সত্যি। জীবনে কোনো পুরুষকে নিয়ে সুখী হবো তা ভাবিনি। কিন্তু তুমি সব কিছু পাল্টে দিয়েছে। এ জায়গায় থাকতে আমার আর ভালো লাগছে না, শেট–আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে। সারাটা দিন শুধু কাজ আর কাজ। কোথাও যে একটু বেড়াতে যাবো তারও কোনো পথ নেই।

আমি ওর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললাম, আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করো লোলা, এখানে থাকতে কি আমারও ভালো লাগছে? কিন্তু এখুনি এজায়গাটা ছেড়ে গেলে বিপদের সম্ভাবনা আছে, তাছাড়া জায়গাটা যে বিক্রী করে দেবো তারও তো উপায় নেই।

লোলা আমার বাহুর বাঁধন খুলে সরে দাঁড়ালো, তারপর বললো, অনেক কাজ পড়ে আছে। ও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম, লোলা আমাকে ভালোবাসে, ও নিজের মুখে বলেছে। আজ আমার আনন্দের দিন। আমি এই মুহূর্ত থেকে ওকে বিশ্বাস করতে শুরু করলাম। আমি লোলাকে জানিয়ে দিলাম যে ঝামেলা মিটে গেলে আমি ওকে বিয়ে করবো। তখন আর না বললে শুনছি না।

লোলা হেসে বললো, না বলতে আমার বয়ে গেছে। কিন্তু কার্ল যে মৃত সেটা তো প্রমাণ করতে হবে!

সেটা প্রমাণ করতে গেলে বিপদ-আছে। যে কোনো উপায়ে হোক আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে। কিন্তু কিভাবে, সেটা পরে ভাবা যাবেখন। যদি একবার এখান থেকে পালাতে পারি তবে আর চিন্তা নেই।

–আচ্ছা, ফ্লোরিডায় আমাদের একটা পেট্রলপাম্প খুললে কেমন হয়?

ভালোই হবে। তার মানে সিন্দুকের টাকাগুলো কাজে লাগানো যাবে, কি বলে?

এতোদিন পরে এই প্রথম ও টাকার কথা উচ্চারণ করলো। খুব সহজভাবে কথাটা বললেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থাকলাম। কিন্তু কোনোরকম অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়লো না। আমি ওর কথা সমর্থন করলাম।

আমরা দুজনে আলোচনা করলাম যে, এই জায়গাটা আগে আমাদের বিক্রী করতে হবে, যেভাবেই হোক।

এমন সময় বাইরে ট্রাকের শব্দ পেলাম। বাইরে বেরিয়ে এলাম। আর তারপরই কাজে এমন ব্যস্ত হয়ে পড়লাম যে লোলার সঙ্গে কথা বলারই কোনো সুযোগ পেলাম না।

হঠাৎ দেখি অপরূপ সাজে সেজে লোলা আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ও আমাকে বলে গেলো যে, ও বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে; দুপুরের দিকে ফিরবে।

আমি কিছুক্ষণের মধ্যে হাতের কাজ সেরে রেস্তোরাঁয় গেলাম। লোলা টাকার উল্লেখ করায় বেশ খুশীই হয়েছি। ওর সম্বন্ধে যেটুকু অবিশ্বাস আমার মনের মধ্যে ছিলো, সেটা

মন থেকে মুছে গেছে। কিন্তু এই পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন-এর হাত থেকে কি ভাবে মুক্তি পাওয়া যায় সেকথাই বারে বারে ভাবতে লাগলাম। কিন্তু ভাবতে ভাবতে দেখছি সমস্যাটা যেন একে একে জটিল হয়ে উঠছে। একসময় মনে হলো আর ভেবে কোনো লাভ নেই, কেননা এখন আমাদের অবস্থা মাকড়সার জালে আটকানো মাছির মতো। মুক্তির কোনো পথই আমাদের সামনে খোলা নেই।

নিরাপদে থাকতে হলে সারাটা জীবন আমাদের এখানেই কাটাতে হবে।

হঠাৎ গাড়ির শব্দে তাকিয়ে দেখি রিক্স তার ঝরঝরে গাড়ি থেকে নেমে গুমটি ঘরের দিকে আসছে। পেছন পেছন এগিয়ে আসছে ওর কুকুরটা।

এতোদিন পরে রিক্সকে দেখে চমকে উঠলাম। মনে পড়ে গেলো গুমটি ঘরেই পোঁতা রয়েছে জেনসনের দেহ। একমুহূর্ত দেরী না করে ছুটলাম গুমটি ঘরের দিকে। বুকের ভেতর যেন দামামা বাজতে শুরু করেছে।

গিয়ে দেখি গুমটি ঘরে এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে রিক্স মাঝে মাঝে যন্ত্রপাতিগুলো নেড়ে চেড়ে দেখছে। কুকুরটাও যেন ওর পায়ে পায়ে লেগে রয়েছে। আমাকে দেখেই কুকুরটা কুঁকড়ে গেলো।

রুক্ষস্বরে রিক্স-কে জিজ্ঞেস করলাম তার কি চাই। রিক্স থমকে দাঁড়িয়ে কুকুরটাকে এক লাথিতে সরিয়ে দিয়ে আড়চোখে তাকিয়ে বললো, কার্ল কোনো খবর-টবর দিয়েছে?

না।

লোলা কোথায় জানতে চাইলে তাকে বললাম যে তিনি ওয়েন্টওয়ার্থ গেছেন।

হঠাৎ দেখি রিক্সের কুকুরটা উৎসুক হয়ে কাজ করবার টেবিলটার দিকে তাকালো। তারপর ছোটো ছোটো পা ফেলে এগিয়ে চললো জেনসনের কবরের দিকে। সীমাহীন আগ্রহে ওখানকার মাটি শুঁকতে লাগলো। মাঝে মাঝে পা দিয়ে আঁচড়াতে চেষ্টা করলো।

বুকের ভেতরটা ধক করে উঠলো। রিক্স কুকুরটাকে লক্ষ্য না করেই বললো, আমার কিছু টাকার দরকার। পেনসনের টাকা এখনও পাইনি।

আমার সমস্ত মন তখন পড়ে আছে কুকুরটার দিকে। কুকুরটা তখন মাটি আঁচড়াতে শুরু করেছে।

রিক্স হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে কুকুরটাকে দেখলো। কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, তুমি কি এখানে কিছু পুঁতেছো?

কেমন যেন শীত শীত করতে লাগলো সারা মুখে ফুটে উঠলো বিন্দু বিন্দু ঘাম– কোনোরকমে মুখে হাত বোলালাম, কিচ্ছু পুঁতিনি!- যাও, যাও, এখন কেটে পড়ো!

আমার কথা কানে না তুলে রিক্স ধীরে ধীরে গর্তটার কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। ওর শকুন চোখজোড়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গর্তটা পর্যবেক্ষণ করছে।

দেখে মনে হচ্ছে গর্তটা আগে কেউ খুঁড়েছে। অধৈর্য হাতের এক ধাক্কায় রিক্স কুকুরটাকে সরিয়ে দিলো, আপন মনেই বলে উঠলো কার্ল হয়তো ওর জমানো টাকা এখানেই লুকিয়ে রেখেছে।

আমার হাত-পা যেন ভয়ে পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যেতে চাইলো। রিক্সের দিকে এক পা এক পা করে এগিয়ে গেলাম। আমার মুখের ভাবে রিক্স ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়ালো।

আমি চীৎকার করে উঠলাম, বেরোও! আর কোনদিন এখানে আসার চেষ্টা করলে ঠ্যাঙ ভেঙে দেব! ওকে তাড়িয়ে নিয়ে চললাম, গাড়িতে উঠে সোজা কেটে পড়ো।

পেছোতে পেছোতে রিক্স ওর গাড়ির কাছে পৌঁছলো। গাড়ির দরজায় হাত রেখে ও হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো, আড়চোখে ঘৃণাভরা চাউনি নিয়ে তাকালো আমার দিকে, আচ্ছা, তুমি তাহলে সোজা কথার মানুষ নও! ওর গলায় যেন বিষ ঝরে পড়লো, শেষ পর্যন্ত পুলিশেই খবর দিতে হবে দেখছি। ওদের বলবো কার্লের খোঁজ করতে। নয়তো, তুমি আর ঐ বেশ্যাটা যেভাবে গা ঘষাঘষি শুরু করেছে

অন্ধক্রোধে রিক্সের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম, আমার ডান হাতের ঘুষি সপাটে গিয়ে আছড়ে পড়লো ওর চোয়ালে। রিক্স ছিটকে গিয়ে বালির ওপর পড়লো। রিক্স ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে কোনো রকমে উঠে দাঁড়ালো। টলতে টলতে গাড়িতে গিয়ে উঠলো। গাড়ি স্টার্ট দেবার আগে বলে গেলো, ও পুলিশে যাচ্ছে।

আমি বুঝতে পারলাম একটা ভীষণ ভুল করে ফেলেছি। রিক্সকে মারা আমার উচিত হয়নি। যাবার সময় রিক্স-এর আগুন ঝরা চোখের দৃষ্টি কিছুতেই ভোলা যাচ্ছিল না।

রিক্স-আতঙ্ক মনের মধ্যে আরো চেপে বসলো। ধীরে ধীরে গুমটি ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। টেবিলটা সরিয়ে মাটি দিয়ে গর্তটা ভরাট করে একগাদা পুরনো লোহালক্কড় এনে ওর ওপরে জমা করলাম। কারণ কুকুরটা আবার এসে জায়গাটা আঁচড়াক, তা আমি চাই না। আধঘণ্টা বাদে কাজ শেষে খাবার ঘরে গেলাম।

রিক্স যে এবার পুলিশে যাবে-তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কি করবো ভেবে ভেবে কোনো পথ পেলাম না।

হঠাৎ জানলা দিয়ে চেয়ে দেখি একটা জরাজীর্ণ লিংকন গাড়ি পাম্পের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাইরে বেরিয়ে এলাম।

গাড়ির স্টিয়ারিং-এ বসে থাকা লোকটিকে যেন চেনা চেনা ঠেকলো। সে গাড়ি থেকে নেমে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। সামনে আসতেই তাকে চিনতে পারলাম। মুহূর্তে স্তব্ধ হলো হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন–কিন্তু পরক্ষণেই ছুটে চললো পাগলা ঘোড়ার মতো উদ্দাম গতিতে

আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আমার বন্ধুরয় ট্রেসি।

.

১০.

আমি ও রয় উভয়ে উভয়কে চিনতে পারলাম। এই হঠাৎ দেখার বিস্ময়কে ওর চোখ যেন মেনে নিতে পারছে না। ওর মুখ রক্তহীন বিবর্ণ।

কিছুক্ষণ পর ওর মুখের বিবর্ণ ভাবটা কেটে গিয়ে ফুটে উঠলো এক অদ্ভুত ঔজ্জ্বল্য; ঠোঁটের কোণায় ফিরে এলো সেই অতি পরিচিত হাসি। ও ছুটে এসে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

আমাদের কারোর-ই তখন আর কথা বলার শক্তি নেই। এক প্রচণ্ড আনন্দ-উল্লাসের অনুভূতি যেন কণ্ঠরোধ করলো।

একসময় আমাকে ছেড়ে দিয়ে রয় সোজা হয়ে দাঁড়ালো, শেট। তুই-তুই এখানে? আমি কি ভুল দেখছি?

ঠিক সেই মুহূর্তে অনুভব করলাম রয়কে আমি কতটা ভালোবাসি। এতেদিনে ওর অনুপস্থিতিতে আমার বুকটা যেন খালি ছিলো। এখন বুঝতে পারছি রয় আমার জীবনে কতখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে। ওকে কাছে পেয়ে সাময়িকভাবে লোলার কথাও ভুলে গেলাম। ওর কাঁধে এক চাপড় মেরে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। কপট তিরস্কারের সুরে বললাম, শালা, সিন্দুকের বাচ্চা! কোথায় ছিলি এতোদিন?

রয় অস্পষ্ট স্বরে বললো কিন্তু শেট তুই এখানে কি করছিস?আমি তো ভেবেছিলাম তুই কোনো শহরে কেটে পড়েছিস!

পুলিশও তাই ভাবছে। কথা বলতে বলতে আনন্দে আমার চোখ সজল হয়ে উঠলো। ওর হাত ধরে আমি ওকে রেস্তোরাঁয় টেনে নিয়ে চললাম। খাবার ঘরে ঢুকে কাউন্টারের কাছে দুটো টুল নিয়ে আমরা বসলাম। রয় ঘরটার চারপাশে চোখ বোলাতে লাগলো। দুটো গেলাসে হুইস্কি আর সোডা মিশিয়ে রয়ের দিকে একটা এগিয়ে দিলাম। অন্যটায় নিজে চুমুক দিয়ে ভাবলাম রয়কে এখনি সব বলাটা ঠিক হবে না। তাই ও যখন জানতে চাইলে আমি এখানে কি করছি। তখন সত্যি মিথ্যে মিলিয়ে একটা জবাব দিলাম, আমি এখানে চাকরি করছি। তাছাড়া গা-ঢাকা দেবার পক্ষে জায়গাটা বেশ নিরাপদ।

রয় আমার কাঁধে আলতো করে হাত রাখলো, ফার্নওয়ার্থ থেকে তোর পালানোর কথা আমি কাগজে পড়েছি। তোর সাহসের প্রশংসা করি। এই কমাস শুধু তোর কথাই ভেবেছি। কোনোদিন ভাবতেই পারিনি, তোর সঙ্গে এভাবে দেখা হবে।

ওর দিকে চেয়ে হাসলাম, সেটা আমিও ভাবিনি।

রয় হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে আমার হাত চেপে ধরলো, শেট, তোকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেবো জানি না। তুই আমার জন্যে যা করেছিস তার তুলনা হয় না। তোকে যখন ওরা ধরলল, আমি তো ভাবলাম তুই বোধহয় আমার কথা বলেই দিবি। কিন্তু না শেট, তুই-ই আমার বন্ধুর মতো । বন্ধু।

সে যাকগে–এখন কি করছিস বল্? আর এখানেই বা কেমন করে এলি?

এখন আমাকে সেলসম্যান হয়ে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে, শেট। অর্থাৎ লরেন্স কোম্পানি এখন কোনোরকমে আমাকে তাড়াতে পারলে বাঁচে। ফ্রাঙ্কলিন থেকে আরম্ভ করে সব

বড়কর্তারাই সন্দেহ করছে কুপারের ব্যাপারটায় তোর সঙ্গে আমিও জড়িত ছিলাম। আর তার ওপর কে আবার বলে বসেছে পাঁচশো ডলারের দেনায় আমি নাকি পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

একদিন ফ্রাঙ্কলিন আমায় ডেকে বললো, আমার আর সিন্দুক টিক সারানোর দরকার নেই। তার চেয়ে যে সব খদ্দেরের পুরানো লরেন্স সিন্দুক আছে, তাদের ধরে ধরে নতুন সিন্দুক গছানোর কাজটা আমি নাকি ভালোই পিরবো। এবং তাতে নাকি আমার অভিজ্ঞতাও বাড়বে। তারপরেই আমার হাতে খদ্দেরদের নামের ইয়া বড় একটা লিস্ট ধরিয়ে দিলো আর কিছু উপদেশও দিয়ে দিলো।

রয় পকেট থেকে একটা লম্বা কাগজের টুকরো বের করলো–এই তোপয়েন্ট অফ নো রিটার্ন-মালিক : কার্ল জেনসন।

এখন আমার কাজ হলো মিঃ জেনসনকে পটিয়ে একটা নতুন সিন্দুক গছানো–আচ্ছা, এই জেনসন লোকটা কে, তোর বস?

বাইরে থেকে একটা ক্যাডিলাকের হর্ন কানে আসায় উঠে বাইরে এলাম।

রয়ের কাছ থেকে কিছু সময়ের জন্য রেহাই পেয়ে মনে মনে খুশীই হলাম। ওকেকতোটা কি বলবো না বলবো, সেটা ভাববার কিছুটা সময় পাওয়া যাবে। ক্যাডিলাক গাড়িটায় তেল ভরতে ভরতে চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়লাম

অনেক চিন্তা ভাবনা করে স্থির করলাম রয়কে সব কিছু বলা ঠিক হবে না। বিশেষ করে জেনসনের খুনের কথা। লোলাই বুঝবে। তার চেয়ে বরং সবাইকে যে গল্পটা বলেছি ওকেও সেটা বলবো। সেটাই নিরাপদ হবে বলে মনে হয়।

কাজ শেষ করে যখন রেস্তোরাঁয় ফিরে এলাম তখন রয় সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি করছিলো। আমি গিয়ে ওকে জানিয়ে দিলাম যে, মিঃ জেনসন এখানে নেই : ব্যবসার কাজে অ্যারিজোনা গেছেন। কবে ফিরবেন কিছুই বলে যান নি।

রয় এ কথা শুনে হতাশায় ধপ করে বসে পড়লো একটা চেয়ারে। তাহলে এতোদূর এসে কোনো লাভ হলো না? তা তুই একবার মিসেস জেনসনকে বলে দেখ না, তিনি হয়তো নতুন সিন্দুক অর্ডার দিতে পারেন ।

আমি ওকে বললাম যে এখানে কোনো আশাই নেই। কেননা মিঃ জেনসনের কথা ছাড়া এখানে কেউ এক পাও চলে না। তোর কপাল খারাপ কি আর করা যাবে।

রয় খুব হতাশ হয়ে পড়লো। রয় বললো যে, সিন্দুকের কাজ ছাড়া তো আর কোনো কাজই আমি জানি না। তাছাড়া বয়সও তো প্রায় পঁয়তিরিশ হলো, এই বয়সে নতুন চাকরি কেই বা দেবে? কথা বলতে বলতে ঘড়ি দেখলাম, একটা বাজে। ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে। আমি রয়কে জানালাম কি কি রান্না করেছি। এমন সময় দুজন ট্রাক ড্রাইভার এসে খাবারের অর্ডার দিলো।

কাজ করতে করতে মাঝে মধ্যেই জানলা দিয়ে বাইরে দেখছি, লোলা এলো কিনা। এততক্ষণে তো লোলা ফিরে আসার কথা। কেন এতো দেরী হচ্ছে বুঝতে পারছি না। হঠাৎ দেখলাম দূরের। বালিয়াড়ির পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটে আসছে লোলার মার্কারি।

খাবারের প্লেটটা এনে রয়ের সামনে রাখলাম, মিসেস জেনসন আসছেন। তারপর গলার স্বরকে অপেক্ষাকৃত নীচু করলাম। এখানে আমার নাম শেট কারসন নয়-জ্যাক প্যাটমোর। যেন ভুল না হয়।

রয় সেই ছেলেবেলা থেকে আমাকে শেট নামে ডেকে অভ্যস্ত। তাই জ্যাক প্যাটমোর বললেও, ও হয়তো ভুল করে শেট নামেই আমাকে ডেকে বসবে। আর তা শুনে লোলা যদি অবাক না হয়, তাহলে ও ভাববে লোলা আমার আসল পরিচয় জেনেও আমাকে এখানে থাকতে দিয়েছে। এবং এতে রয় নির্ঘাত সন্দেহ করে বসবে। হয়তো বুঝতে পারবে যে জেনসনের উধাও হওয়ার পেছনে আমাদের হাত আছে।

এই সমস্ত ভেবেই ওকে ঐ নামটা বললাম।

রয় ঘাড় নেড়ে জানালো, নিশ্চিন্ত থাকুন মিঃ জ্যাক প্যাটমোর। আমার কোনো ভুল হবে না।

লোলা এসে জানালো যে, ওর ফিরতে একটু দেরীহয়ে গেলো। সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা? রোদে একটানা গাড়ি চালানোর ফলে ওর মুখ হয়ে গেছে রক্তাভ।

আমি ওকে কাছে টেনে নিয়ে ওর গালে ছোট্ট করে চুমু খেলাম। বললাম, সব কিছু ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা হয় নি। আমি ওকে আরও জানালাম যে আমার এক ছেলেবেলাকার বন্ধু আজ হঠাৎ এখানে এসে হাজির হয়েছে। কার্লের সঙ্গে ওর কিছু ব্যবসার কথাবার্তা ছিলো। ওকে আমি বলেছি যে কার্ল অ্যারিজোনা থেকে মাস দুয়েকের আগে আর ফিরছে না।

লোলা যেন চমকে উঠলো, তোমার বন্ধু? কিন্তু ও যদি পুলিশে তোমার কথা

আমি লোলাকে জানালাম যে, সে ধরনের ভয়ের কোনো কারণ নেই। ও আমাকে ভীষণ ভালোবাসে।

একসময় খাবার ঘর থেকে কাউন্টারের ওপর অধৈর্যভাবে টোকা মারার শব্দ কানে এলো।

খাবার ঘরে গিয়ে দেখলাম, কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে একজন মোটাসোটা বয়স্ক লোক ও পরনে ফিকে বাদামী রঙের স্যুট। সারা মুখে একটা পরিশ্রান্ত ভাব। জানলা দিয়ে বাইরে তাকাতেই চোখে পড়লো পাম্পের কাছে দাঁড়ানো একটা যাত্রীবাহী বাস। মোটা লোকটির কথামতো যাত্রীরা একে একে বাস থেকে নেমে আসতে লাগলো।

কাউন্টারের কাছে ফিরে আসতে না আসতেই খাবার ঘর খদ্দেরে ভরে গেলো, আরম্ভ হয়ে গেলো কাজ আর কাজ। এর মধ্যেও আবার গোটা কয়েক ট্রাক তেল নেবার জন্য অনবরত হর্ন দিতে লাগলো।

রয়ের তখন খাওয়া-দাওয়া শেষ। ও আমার অবস্থা দেখে আমার কাছে এগিয়ে এসে বললো, আমি সাহায্য করলে তোর আপত্তি আছে? যদি বলিস তবে বাইরে গিয়ে ট্রাকগুলোতে পেট্রল দিই।

তাহলে তো আমার অনেক সুবিধা হয়। খুচরো পয়সা ভরা থলেটা ওর দিকে এগিয়ে দিলাম, পাম্পের মিটারেই দাম লেখা আছে দেখতে পাবি; কোনো অসুবিধা হবে না। থলেটা নিয়ে ও পাম্পের দিকে চললো।

প্রায় ঘণ্টা দুই পরে কাজের চাপ কিছুটা হাল্কা হয়ে এলো। এতোক্ষণ কাজের ভিড়ের মধ্যে রয়ের কথা মনেই ছিলো না। খেয়াল হতে জানলার কাছে গিয়ে দেখলাম পাম্পের কাছে এখনও তিনটে গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। রয় একমনে তাদের উইন্ডস্ক্রীন পরিষ্কার করছে।

লোলা যে কখন রান্নাঘর ছেড়ে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে খেয়াল নেই আমার ও রয়কে একদৃষ্টে দেখতে লাগলো। একসময় আমার দিকে ফিরে প্রশ্ন করলো, শেট, এ লোকটা কে? তোমার সেই বন্ধু নাকি?

হ্যাঁ, আমার বন্ধু রয় ট্রেসি। কাজের চাপ দেখে নিজে থেকেই আমাকে সাহায্য করতে চাইলো। বেশ ভালোই কাজ করছে কি বলল?

হু-লোলার স্বরে এমন একটা কিছু ছিলো, যা শুনে চোখ ফেরাতে গিয়েও থমকে গেলাম। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লোলাকে দেখতে লাগলাম। ও কিন্তু তখনও জানলা দিয়ে রয়ের দিকে তাকিয়ে আছে।

হঠাৎ ওর সবুজ চোখ কোনো এক কুটিল চিন্তায় কুঁচকে উঠলো।.

তোমার বন্ধু কি এখানে কাজ করবে বলেছে শেট? তাহলে ওকে রাখলে কেমন হয়? তুমিই তো বলেছিলে আমাদের একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী প্রয়োজন।

ওকে জড়িয়ে ধরে বললাম আমিও তোমাকে ঠিক এই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম লোলা। রয় আমার ভাইয়ের মতো আর খুবই বিশ্বাসী।

-ওকে তো আগেই বলেছি যে, জেনসন এখানে নেই। এখন জানিয়ে দিলেই হবে, কার্ল অন্য একটা মেয়েকে নিয়ে কেটে পড়েছে। ও কোনো সন্দেহই করবে না।

কিন্তু রয় কি এই নির্জন জায়গায় থাকতে চাইবে?

লোলার কাঁধে হাত রেখে হাসলাম, তবে একটা কথা বলতে পারি লোলা–তোমার দিকে রয় কখনই হাত বাড়াবেনা। উনিশ বছর বয়সে ওর বউ পালানোর পর থেকে, ও কোনো মেয়েকেই সহ্য করতে পারে না।

ওই রয় আসছে। এলে ওকে জিজ্ঞেস করবে থাকবে কিনা। রয়কে আসতে দেখে চাপা স্বরে লোলা বললো।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রয় খাবার ঘরে এসে ঢুকলো। লোলাকে দেখেই ও থমকে দাঁড়ালো; অবাক। হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো। অন্য কেউ লোলার দিকে এভাবে চেয়ে থাকলে হয়তো অস্বস্তি বোধ করতাম। কিন্তু রয়কে যেহেতু আমি চিনি তাই হাসতে হাসতে

লোলার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিলাম। রয়, ইনিই মিসেস জেনসন-লোলা, এ আমার বন্ধু রয় ট্রেসি।

লোলা রয়ের দিকে চেয়ে হাসলো, সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ।

-ও কিছু নয়, রয় হেসে লোলার হাসি ফিরিয়ে দিলো, সত্যি মিসেস জেনসন, এই জায়গাটা ভারী চমৎকার!

আমি এই সুযোগে রয়কে বললাম, তাহলে এখানে থেকেই যানা। সুযোগ বুঝে রয়কে বললাম, রাস্তার ওপরে একটা ঘর আছে, ওখানে থাকতে পারিস। আর সপ্তাহে চল্লিশ ডলার করে মাইনে পাবি।–কি রে রাজি?

রয় আমার দিক থেকে চোখ সরিয়ে লোলার দিকে তাকালো; মুখের ধূর্ত হাসিটাকে আরও ধূর্ত করলো, আপনি যদি রাজি থাকেন, তাহলে আর আপত্তি করার কি আছে মিসেস জেনসন?

আমি লোলাকে বললাম, ভালো করে ওর আদর যত্ন করো-সেই স্কুল থেকে ও আমার বন্ধু; শুধু বন্ধু কেন, একেবারে ভাইয়ের মতো।

এমন সময় একটা ফোর্ড স্টেশন ওয়াগন একরাশ ধুলো উড়িয়ে পাম্পের কাছে এসে থামলো আমরা সবাই মিলে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

রাত দশটার সময় গাড়ি-ট্রাকের ভিড় কমলে আমরা খেতে বসলাম। ডিনার টেবিলের একদিকে আমি আর লোলা। আমাদের মুখোমুখি টেবিলের অপর দিকে রয় বসেছে। রয়ের উপস্থিতি আমার কাছে কিছুটা অস্বস্তির কারণ হলেও লোলাকে বেশ উৎফুল্ল মনে হলো নতুন চাকরিতে ঢুকে রয় এর আনন্দ আর ধরে না। সমানে কথা বলে যাচ্ছে।

জায়গাটা আমার ভীষণ ভালো লেগেছে শেট! কে ভেবেছিলো বল, এভাবে হুট করে তোর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা লোভনীয় চাকরি পেয়ে যাবো। ঘুরে ঘুরে সিন্দুক বেচার চেয়ে এখানে চাকরি করা অনেক ভালো।

লোলা খেতে খেতে থমকে তাকালো রয়ের দিকে, তুমি বুঝি সিন্দুক কোম্পানিতে চাকরি করতে?

রয় বললো, আপনার কাছে গোপন করে লাভ নেই মিসেস জেনসন, এই সিন্দুকের লাইনে আমাদের চেয়ে অর্থাৎ আমার আর শেটের চেয়ে ভালো কারিগর আর নেই। আমি আর শেট একই দিনে, একই কোম্পানিতে চাকরি নিয়েছিলাম। অবশ্য ও আমার চেয়ে অনেক ভালো কারিগর, তবে সিন্দুক খোলার ব্যাপারে ওর চেয়ে আমার অভিজ্ঞতা বেশী। আর ওকে নিয়ে অসুবিধা হলো, ও একটু বেশী সাধুপুরুষ। ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়ার দিন থেকে আজ পর্যন্ত ও শুধু আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেই গেছে। সব সময় আমি ওকে ঝামেলায় জড়িয়ে গেছি, আর শেষ পর্যন্ত ও-ই আমাকে বাঁচিয়েছে।

রয় হঠাৎ গম্ভীর মুখে বললো, কিন্তু মিঃ জেনসন ফিরে এসে আমাকে দেখলে কি ভাববেন? ও লোলার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, মিসেস জেনসন, চাকরীটা স্থায়ী হলে ভালো হয়।

কার্ল ফিরবে বলে আমার মনে হয় না। লোলার বিষণ্ণ স্বর শোনা গেলো। আর যদিও বা ফিরে আসে, তোমাকে দেখলে আনন্দ পাবে। আমি কাউকে এখনও বলিনি। চিঠিতে কার্ল পরিষ্কার করে না লিখলেও আমার মনে হয় ও আর ফিরবে না। অ্যারিজোনায় গিয়ে কার্ল আর একটা মেয়ের সন্ধান পেয়েছে, যাকে ওর আমার চেয়ে অনেক বেশী ভালো লেগেছে। কথা শেষ করে লোলা চুপ করে রইলো।

রয় সব শুনে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলো, আমি দুঃখিত মিসেস জেনসন

লোলা হেসে বললো, এতে দুঃখিত হওয়ার কি আছে–ও হাত রাখলো আমার হাতে, এখন আমি আর শেট কার্ল যে শেটকে এখানে রেখে গেছে তাতেই আমি খুশী। আর আমি কিছু চাই না।

রয় আমার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে মাথা নাড়লো, শেট, তোর ভাগ্য সত্যিই অসাধারণ।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, চল্ তোর ঘর দেখিয়ে দিই। রয়কে নিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম। চাঁদের আলোয় ভেজা বালির রাস্তা ধরে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। রাস্তার ওপারে পৌঁছে ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম।

রয় ঘরের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে একেবারে অবাক হয়ে গেলো। এ যে সাংঘাতিক কাণ্ড দেখছি! টেলিভিশন পর্যন্ত রয়েছে। তারপর ও ঘরের জানলা দিয়ে রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা জেনসনের বাংলোর দিকে তাকালো, তুই কি ওখানে থাকিস?

হ্যাঁ, তাছাড়া আর কোথায় থাকবো?

রয় ওর মালপত্রের ব্যাগটা একটা চেয়ারে নামিয়ে রেখে সিগারেট ধরালো। রয়কে দেখে মনে হলো, ব্যাপার-স্যাপার দেখে ওর সন্দেহ হচ্ছে। যেভাবে হোক ওকে বিশ্বাস করাতেই হবে, না হলে আসল ব্যাপারটা ও ধরে ফেলবে।

ওর সন্দেহাতুর চোখ আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। তারপর একসময় আমাকে বললো, তুই যে ঝামেলায় জড়িয়ে আছিস সেকথা লোলা জানে?

আমি উত্তর দিতে কয়েক মুহূর্ত দেরী করলেও ঠিক করলাম, লোলা যে আমার সম্বন্ধে সবই জানে একথা রয়কে জানাতে কোনো বাধা নেই। হাজার হলেও ও আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু। তাই সম্মতি জানিয়ে জবাব দিলাম, হ্যাঁ, বলেছি।

আমার উত্তরে রয় একটুও অবাক হলো না। হয়তো এই উত্তরই ও আশা করেছিলো।

রয় একমনে ওর ব্যাগ খালি করে জিনিসপত্রগুলো বিছানার ওপর ছড়িয়ে রাখতে লাগলো। –এ জায়গাটাকে ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারলে তুই রাজা হয়ে যাবি।–সপ্তাহে কি রকম আমদানি হয় শেট?

জেনসন মারা যাবার পর থেকে সাপ্তাহিক আয় একেবারে কমে গেছে। কারণ ওর পুরনো লোহালক্কড়ের ব্যবসা থেকেই একটা মোটা টাকা আসতো আর এই লোহালক্কড়ের ব্যাপারে আমি আর লোলা সমান পণ্ডিত। তাই কার্ল মারা যাবার পরই লোহালক্কড়ের ব্যবসা একেবারে মুখ থুবড়ে পড়েছে। বর্তমানে আমাদের ভরসা রেস্তোরাঁ, পেট্রল এবং গাড়ি মেরামত। কিন্তু হলে কি হবে যা আশা করেছিলাম, আয়পত্তর তার চেয়ে অনেক কম, সপ্তাহে মাত্র শদুয়েক ডলার কোন প্রকারে লাভ হয়। সেটাকাটা আমি আর লোলা ভাগাভাগি করে নিই। জেনসন মারা যাবার পর, ওর সিন্দুকে আমার জমানো টাকা ঠিক যেমন ছিল তেমনই আছে? ওতে আর হাত দিইনি। প্রতি সপ্তাহে আমার ভাগের একশো ডলার ঐ সিন্দুকেই জমিয়ে রাখি।

কিরে শেট, বললি না তো আমদানি কেমন হয়?

রয়ের কথায় আমার চমক ভাঙালো। ভাবনা চিন্তা ছেড়ে তাড়াতাড়ি জবাব দিলাম, তুই যতো ভাবছিস ততো নয়। এই শ দুয়েক ডলার আসে আর কি!

রয় জানালো যে ঠিকমতো কায়দা করতে পারলে, এই ধরনের একটা জায়গাকে কাজে লাগিয়ে মোটা টাকা আমদানি করা যায়।

তুই কি এই নির্জন জায়গায় চিরজীবন পড়ে থাকতে চাস, শেট? ছেলেবেলা থেকেই আমরা সবসময় ভেবেছি কি করে বড়লোক হবো, দুটো পয়সার মুখ দেখবো!–তাই তো বললাম, এ জায়গাটা কাজে লাগাতে পারলে তুই রাজা হয়ে যাবি। রয় এসে আমার মুখোমুখি বসলো।

আমি জানতে চাইলাম কাজটা কি ধরনের?

এই ধর, মেক্সিকো ছেড়ে যারা পালাতে চায়, তাদের হেলিকপ্টারে করে এখানে নিয়ে আসা যায়;–এ জায়গাটা তাদের ভালোই লাগবে। আর আমরাও মাথাপিছু দুশা ডলার করে পাবো।

রয়, তুই যদি মাস দুয়েক ফার্নওয়ার্থে থাকতিস, তবে আর এ-ধরনের কথা বলতিস না। ওকে আমি শান্ত স্বরে বললাম।

রয় মাথার চুলে হাত চালিয়ে নির্লজ্জের মতো হাসলো। কিছুটা অস্বস্তি ভরেই বললো, সে কথা ঠিক শেট। তোর মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু বড়লোক হওয়ার আশা আমি ছাড়তে পারবো না। আজ হোক কাল যোক বেশ কিছু টাকা আমার চাই-ই চাই।

আমিও ওকে জানিয়ে দিলাম, বেশ কিছু টাকা যে সে এখান থেকে পাবে না এটা নিশ্চিত।

রয় উঠে টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। একটা ড্রয়ার খুলে কতকগুলো শার্ট প্যান্ট তাতে রাখলো। তারপর মুখ ফিরিয়ে তাকালো আমার দিকে, শেট, সত্যিই কি তোর আর বড়লোক হওয়ার সাধ নেই?

না, রয়-ফার্নওয়ার্থের দাওয়াই খেয়ে সে ইচ্ছা আমার মিটে গেছে। তুই খেলে তোরও যেতো!

শুনেছি ওরা নাকি কয়েদীদের প্রতি খুব নৃশংস ব্যবহার করে–গোটাকয়েক রুমাল বিছানা থেকে তুলে ও দ্বিতীয় ড্রয়ারটা খুললো। কিন্তু সেগুলো রাখতে গিয়েই তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো রয়, আরে! এটা কি?

ওর কথার সুরে চমকে উঠলাম। অশান্ত হৃৎপিণ্ড যেন ধাক্কা খেলো এক অদৃশ্য কাঁচের দেওয়ালে, কিসের কথা বলছিস?দুরু দুরু বুকে প্রশ্ন করলাম। আমার আশঙ্কা মিথ্যে নয়। রয় ৪৫ বোরের রিভলবারটা ততক্ষণে ড্রয়ার থেকে বের করে ফেলেছে; যে রিভলবারের গুলিতে জেনসন প্রাণ দিয়েছে।

আমার চোখের সামনে যেন গোটা পৃথিবীটা দুলে উঠলো। মাথার প্রতিটি চিন্তার কোষ ভীষণভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কি উত্তর দেবো কিছুই ঠিক করতে পারলাম না।

আমার মনেও নেই যে সেই ঘটনার পর রিভলবারটা লোলার কাছ থেকে নিয়ে, পরে কখন ঐ ড্রয়ারটায় রেখে দিয়েছিলাম। এতোদিন ধরে ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিলাম। এখন কি বলবো ওকে?

হঠাৎ ইচ্ছে হলো একলাফে রয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রিভলবারটা কেড়ে নিই, কিন্তু অনেক কষ্টে সে ইচ্ছা দমন করে কোনোরকমে জবাব দিলাম, ও, ওটা? ওটা জেনসনের রিভলবার। ও চলে যাবার পর একদিন ঐ রিভলবারটা পেয়ে এই ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রেখেছিলাম। যতোটা সম্ভব সহজ হবার চেষ্টা করলাম।

রয় নিষ্পলক চোখে রিভলবারটার দিকে তাকিয়ে ছিল। গুলি ভরার সিলিন্ডাউটা ও আঙুল দিয়ে ঘোরালো। রিভলবারের নলটা নাকের কাছে এনে শুকলো, খুব সম্প্রতি এটা থেকে

গুলি ছোড়া হয়েছে দেখছি। আত্মগতভাবে শেষ কথাগুলো বলে রয় ওর অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে মারলো আমার চোখে, জানতে চাইলে এই গুলিতে কে মারা গেছে?

বহু কষ্টে ওর চোখে চোখ রাখলাম। অপরাধবোধের ছায়াকে মুখের আয়না থেকে সরিয়ে রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করলাম, কেউ মারা যায়নি, রয়। জেনসন এটা দিয়ে চিল শিকার করতো। হয়ত গুলি করার পর রিভলবারটা পরিষ্কার করতে ভুলে গেছে।

৪৫ রিভলবার দিয়ে কেউ যে পাখী স্বীকার করে, তা তো জানতাম না!

রয় রিভলবারটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলো, তাহলে জেনসনের টিপ আছে বলতে হবে।

এগিয়ে গিয়ে টেবিল থেকে রিভলবারটা তুলে নিয়ে পকেটে রাখলাম, যাকগে অনেক দেরী হয়ে গেলো–আমি চলি।

রয় হঠাৎ প্রশ্ন করলো আজ রাতে কে জাগছে শেট?

আমি। কিন্তু কাল রাতে তোর ডিউটি।

দরজার দিকে পা বাড়ালাম, হঠাৎ রয় ডাকতে পিছন ফিরে তাকালাম।

কি বলছিস, বল!

৪৫ টা পরিষ্কার করে রাখিস। যে বন্দুকে বারুদের গন্ধ লেগে থাকে, সে বন্দুককে কখনো বিশ্বাস নেই!

ওর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিলাম, ঠিকই বলেছিস, আচ্ছা-গুড নাইট!

ঘর ছেড়ে বাইরে আসতেই লক্ষ্য করলাম রেস্তোরাঁয় কোনো আলো নেই; কিন্তু বাংলোয় লোলার ঘরে আলো জ্বলছে। সুতরাং বাংলোর দিকে এগিয়ে গেলাম।

লোলা বিছানায় বসে মোজা খুলছিলো। পরনে সাদা অন্তর্বাস ও নাইলনের প্যান্টিস।

আমি ঘরে ঢুকতেই ও ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে একবার দেখলো।

লোলা আমাকে বললো, শেট তোমার বন্ধুকে আমার ভালো লেগেছে।

তা ভালো, কারণ, রয় আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পকেট থেকে রিভলবারটা বের করে টেবিলের একেবারে ওপরের ড্রয়ারটায় রাখলাম। লোলা আমার দিকে পিছন ফিরে থাকায় কিছু দেখতে পেলো না। ঠিক করলাম, কালই রিভলবারটা পরিষ্কার করে রাখবো।

ড্রয়ার বন্ধ করে লোলাকে বললাম, আমরা তিনজনে এক সঙ্গে থাকলে, দিনগুলো বেশ ভালোই কাটবে। তবে একটা কথা কি জানো, রয় মেয়েদের ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও কৌতূহলী নয়। মাঝে মাঝে ভারী অবাক লাগে, সেই যে একবার উনিশ বছর বয়েসে

ওর বউ পালালো-ব্যস,ঐ শেষ! তারপর থেকে রয়কে কোনো মেয়ের দিকে তাকাতে দেখিনি।

লোলা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। অবশিষ্ট জামাকাপড় ছেড়ে রাত্রিবাস পরতে লাগলো, শেট পৃথিবীতে এমন কোনো পুরুষ নেই, যে মেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট হয় না–সেটা শুধু নির্ভর করে কি রকম মেয়ে তার ওপর। লোলার কথায় যে একটা ঔদ্ধত্যের সুর লুকিয়ে আছে সেটা

আমার কান এড়ালো না।

লোলা, রয়কে আমি তিরিশ বছর জানি। আজ পর্যন্ত মাত্র একটি মেয়ের প্রতিই ও আকৃষ্ট হয়েছিলো, সে ওর বউ। কিন্তু বছর দুয়েকের মধ্যেই সে সব আকর্ষণ ধুয়ে-মুছে মিলিয়ে গেছে।

লোলা বিছানায় শুয়ে পড়লো, হাই তুলতে তুলতে বললো, তুমি একটা বাজলেই চলে এসো কেমন?

হ্যাঁ, ঝুঁকে পড়ে ওকে চুমু খেলাম। বললাম, চুপ করে ঘুমোও ফিরে এসে তোমাকে আর জাগাবো না।

সেই ভালো আমার ভীষণ ক্লান্তি লাগছে। তারপর আমার দিকে চেয়ে হেসে বললো, সকালে তোমার কোন অসুবিধা হয় নি তো?

রিক্সের কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। রয়কে নিয়ে আনন্দে এতো মেতেছিলাম যে ব্যাপারটা মনে ছিলো না।

লোলা আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

আমি বললাম, রিক্স আজ এসেছিলো। ওর গায়ে হাত তুলতে আমাকে বাধ্য করেছে। এছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না।

লোলা উত্তেজনায় আমার হাত চেপে ধরলো, আমাকে সব খুলে বলল। রিক্স কি করেছিলো?

ওকে সমস্ত কথা বললাম, লোলার সবুজ চোখজোড়া উত্তেজনায় বিস্ফরিত। সারা শরীর চাবুকের মতো টানটান।

লোলা বললো, শেটরিক্স পুলিশে যাবে না। আর গেলেও পুলিশ ওর কথা বিশ্বাস করবে না। ওরা রিক্সকে ভালোভাবেই চেনে। কিন্তু তুমি ওকে মারতে গেলে কেন? যাক্ ও নিয়ে আর চিন্তা করোনা। পুলিশের কাছে গেলে ওরা রিক্সকে সোজাসুজি তাড়িয়ে দেবে।

লোলার কপালে চুমু খেয়ে বললাম, শুয়ে পড়োকাজ সেরে আমি ফিরে আসছি।

আমি বাংলো ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

.

১১.

পরদিন সকালে প্রাতঃরাশ খাবার সময় রয়কে রিক্সের কথা জানালাম। ওর কাছ থেকে সাবধানে থাকিস। যখন তখন হুটহাট করে এখানে ঢুকে পড়ে। এই তো কালই এসেছিলো–একেবারে অসহ্য; কাল তো রাগের মাথায় ব্যাটাকে মারধোর দিয়েছি। তারপর ও বলেছে পুলিশে খবর দেবে।

রয় চমকে মুখ তুলে তাকালো, পুলিশ! তার মানে?

রিক্স একদিন আমাকে আর লোলাকে অন্তরঙ্গ অবস্থায় দেখে ফেলে। জেনসন যে অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে লটকে পড়েছে, সে খবর ও জানে না। তাই এখন ও কার্লকে খুঁজে বের করতে চায় ওর পেনসনের কাগজে কি সব সইয়ের ঝামেলা আছে। তাছাড়া রিক্স আমাকে খুব একটা ভালো চোখে দেখে না

কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরালো রয়-তাহলে লোলা ওকে বলছে না কেন, জেনসন আর ফিরবে না?

হয়তো সেটা রিক্সকে বলার প্রয়োজন নেই আর বললেও রিক্স সে কথা বিশ্বাস করবে না।

রয় চিন্তিত ভাবে মাথা নাড়লো।

আমি রয়কে বললাম, যা বলছিলাম, আমরা যখন থাকবো না, তখন যদি রিক্স এখানে আসে সোজা তাড়িয়ে দিবি। এখান থেকে কোনো জিনিস নিয়ে যেতে দিবি না বুঝলি?

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম, যাকগে–আয়, ঘরটা পরিষ্কার করে ফেলা যাক। প্রত্যেকদিন সকালে লোলাই পরিষ্কার করে; কিন্তু, এখন তুই এসেছিস

রয়ের দিকে চেয়ে হাসলাম তাই লোলা এখনও ঘুমোচ্ছে

খাবার ঘর পরিষ্কার করতে করতে রয়কে জানালাম ফার্নওয়ার্থ থেকে আমার পালানোর ইতিহাস। ঝাট দেওয়া বন্ধ করে রয় একমনে শুনতে লাগলো। ওর মুখ দেখে মনে হলো এই অবিশ্বাস্য গল্প ও কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না।

আমার কথা শেষ হতেই ও আমাকে জাপটে ধরে বললো, তোর সাহস আছে বলতে হবে। কি করে পালালি! একবার ভয়ও করলো না?

আমি বললাম, ফার্নওয়ার্থ থেকে পালানোর জন্যে কুকুর কেন, বাঘের মুখোমুখি হতেও কোনো কয়েদী পিছপা হবে না।

ফার্নওয়ার্থে ফেরার থেকে আমার মৃত্যুও অনেক ভালো বলে আমি মনে করি।

হঠাৎ জানলা দিয়ে বাংলোর দরজায় চোখ পড়তেই লোলাকে দেখলাম ও রেস্তোরাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। পরনে সেই চোলি আর একটা খাটো প্যান্ট। মাথায় একরাশ তাম্রাভ চুল একটা সবুজ ফিতে দিয়ে অগোছালো ভাবে বাঁধা।

ওকে দেখামাত্রই কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করলাম। কারণ সেদিন বারণ করার পর থেকে লোলা এই পোশাকে আর বাইরে বের হয় না। তাহলে আজ কেন? ও বুঝেছি পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন-এ যেই একজন অপরিচিত পুরুষের আগমন ঘটেছে অমনি লোলা ওর ভরা যৌবনের পসরা সাজিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। আড়চোখে রয়কে দেখলাম। ও কাজ করতে করতে থমকালো, চোখ তুলে তাকালো লোলার দিকে। ও তখন দরজার গায়ে হেলান দিয়ে স্থির চোখে রয়ের দিকে তাকিয়ে আছে।

লোলা আজ যেন আরও বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রয়ের চোখের সামনে নিজেকে অনেক বেশী লোভনীয় করে তুলেছে।

কিন্তু রয়ের মুখের ভাবে কোনো পরিবর্তন হলো না। ও শূন্য দৃষ্টিতে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার কাজে মন দিলো।

লোলা চুপচাপ রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেলো। দরজার কাছে পৌঁছে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে রয়কে দেখলো। রয় তখনও সেই একইভাবে কাজ করে চলেছে আর আপন মনেই হালকা সুরে শিস দিচ্ছে। রয় লোলার দিকে পেছন ফিরে থাকায় ওর মুখের ভাব দেখতে পেলো না। কিন্তু লোলা রান্নাঘরে ঢুকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করতেই ও মুখ ফিরিয়ে একবার রান্নাঘরের দিকে তাকালো। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলো, শালা রমনীর মনঃ দেবান জানন্তি, কুত মনুষ্যাঃ! কোনদিন কোনো মেয়েকে সন্তুষ্ট হতে দেখলাম না।

আমারই দোষ। হেসে রয়কে বললাম, আমিই তোর কথা ওকে বলেছি। বলেছি যে মেয়েদের সম্বন্ধে তুই এতোটুকু কৌতূহলী নয়। একথা শুনে লোলা তো কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। বলে এ নাকি হতেই পারে না।

রয় হেসে জবাব দিলো এবার বোধহয় বিশ্বাস করবে।

এমন সময় বাইরে থেকে একটা ট্রাকের শব্দ পাওয়া গেলো। রয় বললো, তুই থাক, আমিই যাচ্ছি।

ও বেরিয়ে যেতেই রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

লোলা মুখ গোমড়া করে টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। এর মধ্যেই ও কাজ করার গাউনটা পরে ফেলেছে। আমাকে ঢুকতে দেখেই বললো, শেট আজ রাতে আমরা সিনেমায় যাবো। রয় এখানে দেখাশোনা করবে, কোনো অসুবিধা হবে না।

আমি একটু ইতস্ততঃ করে বললাম, আমাদের দুজনের একসঙ্গে ওয়েন্টওয়ার্থে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? লোলা, আমার মনে হয় আরও কিছুদিন আমাদের অপেক্ষা করা ভালো।

লোলার মুখের ভাব কঠিন দেখালো চট করে ঘুরে আমার দিকে তাকালো।

না, বলছিলাম–জেনসন যে অ্যারিজোনায় গিয়ে অন্য মেয়ের সঙ্গে ভিড়ে গেছে, সে গল্পটা তো কেউ জানে না–তাই ভাবছিলাম, লোকে আগে গল্পটা শুনুক। তারপর আমরা

একসঙ্গে যেখানে-সেখানে ঘুরবো, কারোর কিছু বলার থাকবে না। কিন্তু তার আগে আমাদের দুজনের

আমার কথা শেষ হতে না হতেই লোলা রাগ করে বলে উঠলো, ওসব বাজে কথা আমি শুনতে চাই না। আজ রাতে আমি সিনেমায় যাবো আর তুমিও আমার সঙ্গে যাবে।

ঠিক আছে এত করে যখন বলছো,যাবো।বারোটার শো তো, কেউ যে আমাদের দেখে ফেলবে সে সম্ভাবনা কম।

দেখে ফেললেই বা আমাদের তাতে বয়েই গেলো। লোলার কণ্ঠস্বর অধৈর্য।

কিন্তু তুমি একটা কথা ভুলে যাচ্ছে। লোলা, কার্লকে আমরা এইখানেই কবর দিয়েছি। যদি সন্দেহের বশবর্তী হয়ে পুলিস এখানে আসে তাহলে

লোলা ব্যাঙ্গের সুরে বললো তার মানে বাকী জীবনটা আমাকে পুলিশের ভয়েই কাটাতে হবে; এই তুমি বলতে চাও?

এমন সময় রয় এসে রান্নাঘরে ঢুকলো।

রয়কে দেখেই লোলা বললো, রয় আমি আর শেট রাতে সিনেমায় যাচ্ছি। তুমি একা সব সামলাতে পারবে তো?

রয় একটু অবাক হলেও মুখে সে কথা প্রকাশ করলো না। বললো যে তার কোনো অসুবিধা হবে না।

লোলা ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার তার কাজে মন দিলো।

রয় আমাকে লক্ষ্য করে বললো, শেট এক মিনিট একটু বাইরে আয়। গাড়িটার সবকটা প্লাগই খারাপ হয়ে গেছে। একটু দেখ, ঠিক করতে পারিস কিনা। আমি ওকে বললাম, এবারে গাড়ির কাজকর্ম একটু আধটু শেখ, না হলে অসুবিধায় পড়তে হবে।

রয় রান্নাঘরের দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। ওর পেছন পেছন আমিও চললাম। কিন্তু রান্নাঘরের দরজা খুলেই ও দাঁড়িয়ে পড়লো। ব্যাপারটা আচমকা ঘটে যাওয়ায় নিজেকে সামলাবার সময় পেলাম না। সোজা গিয়ে ওর গায়ে ধাক্কা খেলাম।

রয়ের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকালাম, আর জানলা দিয়ে দেখতে পেলাম বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটাকে। গাড়ির আরোহী দুজনের পরনেই কালো স্যুট আর স্টেটসন হ্যাট। দুজনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত মোটাসোটা লোকটি গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো। তার কোটের ওপর বুকের কাছে লাগানো রয়েছে একটা রূপোর তারা। প্রখর সূর্যের আলো সেই তারার গায়ে ঠিকরে পড়ছে।

গাড়ি থেকে নামার সময় লোকটার কোটটা একটু ফাঁক হতেই চোখে পড়লো তার কোমরের বেল্টে আঁটা ৪৫ রিভলবার।

রয় চাপাস্বরে ফিসফিস করে বললো, পুলিশ!

ততক্ষণে আমিও বেশ বুঝতে পেরেছি। মেরুদণ্ড দিয়ে একটা বরফ শীতল স্রোত নেমে গেলো। পুলিশ কেন? তাহলে কি

পাগলের মতো লোলার দিকে ফিরে তাকালাম। অদ্ভুত মনে হলেও এক আশ্চর্য ভয়ার্ত অনুভূতি আমার মনকে ছেয়ে ফেললো। মনে হলো এই আসন্ন বিপদ থেকে একমাত্র লোলাই আমাকে রক্ষা করতে পারে।

যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি লোলার কাছে এগিয়ে গেলাম। লোলা, শেরিফ এখানে আসছে।

লোলা কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে বললো, কোনো ভয় নেই শেট, শেরিফের সঙ্গে আমিই কথা বলছি। লোলার ব্যবহারে খুব অবাক হয়ে গেলাম। ও এতো শান্ত, সহজ ও নির্বিকারভাবে কথাগুলো বললো যে বিশ্বাসই হতে চায় না।

অবশ্য লোলার থেকে ভয়টা আমারই বেশী কারণ ফার্নওয়ার্থ থেকে আমিই পালিয়ে এসেছি।

আতঙ্কে আমার শরীর কাঁপতে লাগলো। আমাকে এবংরয়কে পাশ কাটিয়ে লোলা ঘরে গেলো। সঙ্গে সঙ্গেই কানে এলো লোলার অকম্পিত কণ্ঠস্বর, কি ব্যাপার, শেরিফ? হঠাৎ কি মনে করে?

আমি ও রয় দেওয়ালে কান পেতে শুনতে লাগলাম ওদের কণ্ঠস্বর, কথাবার্তা। কানে এলো শেরিফের সুস্পষ্ট ভরাট কণ্ঠস্বর, মিঃ জেনসনকে একটু ডেকে দিন কয়েকটা কথা আছে।

কার্ল তো এখানে নেই, বাইরে গেছে, লোলার স্বর অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক। কল্পনার চোখে দেখতে পেলাম শেরিফের মুখোমুখি লোলা দাঁড়িয়ে, ওর সবুজ চোখে শূন্য নিষ্পাপ দৃষ্টি। মনে হলো লোলাকে কায়দা করা এতো সহজ নয়। তবুও কেন জানিনা শেরিফকে দেখার পর থেকে কিছুতেই সহজ হতে পারছি না।

মিঃ জেনসন এখানে নেই? লোলার কথায় শেরিফ যথেষ্ট অবাক হয়েছে বলে মনে হলো, আশ্চর্য ব্যাপার মিঃ জেনসন কোনদিন এই জায়গা ছেড়ে গেছে বলে তো আমার মনে পড়ে না। আচ্ছা কোথায় গেছে বলতে পারেন?

লোলার কথায় ফুটে উঠলো অবহেলার সুর, কি জানি কোথায় গেছে! বলে তো গিয়েছিলো কয়েক জায়গায় ঘোরাঘুরি করবে। হয়তো অ্যারিজোনা কিংবা কোলোরাডো আছে–ঠিক বলতে পারবো না। ও তো গিয়ে পর্যন্ত একটা চিঠিও দেয়নি।

কবে ফিরবে কিছু বলে গেছে? একটু পরেই শোনা গেলো।

লোলার স্পষ্ট শীতল উত্তর, আমার তো মনে হয় কার্ল আর ফিরবে না।

শেরিফ যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর শেরিফ একটু দ্বিধাগ্রস্ত স্বরেবলছেন, ও তাইনাকি? কিন্তু মিসেস জেনসন, আপনি কি করে বুঝলেন, মিঃ জেনসন আপনাকে

শেরিফকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে লোলা বলে উঠলো কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে অন্য মেয়েকে বিয়ে করেছে, এ ঘটনা তো আজ নতুন নয়। লোলার কণ্ঠস্বর এবার ধারালো হয়ে উঠল কিন্তু এসবে আপনার কি প্রয়োজন বলুন তো, শেরিফ? কার্ল কি করলো না করলো, সে আমি বুঝবো; আপনি এতে নাক গলাচ্ছেন কেন?

শেরিফের গলার স্বর শোনা গেলো। আমি দুঃখিত, মিসেস জেনসন। মিঃ জেনসন যে আপনার সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করতে পারেন তা আমার মাথায়ও আসেনি।

না, এতে কার্লের খুব একটা দোষ নেই, দোষ আমার। কারণ ওর মতো বয়স্ক লোককে বিয়ে করে আমি খুব ভুল করেছি। বিয়ের পর থেকেই ওর সঙ্গে আমার বনিবনা হতো না। এতদিন যে আমরা কি করে একসঙ্গে কাটালাম ভাবতেই অবাক লাগে–তবে কার্ল আমাকে এ জায়গাটা দিয়ে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেনা হলে, আমাকে হয়তো না খেয়েই মরতে হতো। কিন্তু কালের সঙ্গে আপনার কি দরকার তা তো বললেন না, শেরিফ! অবশ্য আমাকে বলতে যদি আপনার অসুবিধা না থাকে।

শেরিফ বললেন, আপনার এখানে জ্যাক প্যাটমোর নামে একটা লোক কাজ করে শুনলাম ভয়ে আমার বুকটা কেঁপে উঠলো। চারিদিকে একটা হাতিয়ারের সন্ধানে চোখ

বোলালাম, মাংস কাটার ছুরিটা টেবিলের ওপরই পড়ে ছিলো। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে ওটা তুলে নিলাম।

রয় আমাকে ছুরিটা তুলতে দেখেই ইশারায় বারণ করলো। দেখলাম, বিপদের আশঙ্কায় ওর মুখ সাদা হয়ে গেছে। আমার মুখের ভাবে ও বোধ হয় বুঝতে পারলো বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমি কিছুতেই ধরা দেবো না। কিন্তু শেরিফের রিভলবারের কথা চিন্তা করেই ও আমাকে নিরস্ত করতে চাইলো, কিন্তু একবারও আমারকথা বুঝলোনা।বুঝতে পারলোনা, ফার্ণওয়ার্থের চেয়ে যে কোনো মৃত্যু আমার কাছে শ্রেয়।

এবার লোলার উত্তর শুনতে পেলাম, প্যাটমোর?হ্যাঁ,ও এখানে কাজ করে। কার্ল যাবার আগে ওকে এখানে চাকরিতে ঢুকিয়ে ছিলো। আর আমার কাজের সাহায্যের জন্যে একজন তোক তো এমনিতেই দরকার, তাই ওকে আর ছাড়াইনি।

ও–আচ্ছা, ওকে একবার ডাকুন তো, ওর সঙ্গে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই।

তা বেশ তো–দেখুন, ও বোধ হয় গুমটিঘরে রয়েছে লোলার স্বর অত্যন্ত স্পষ্ট ও স্বাভাবিক, সম্ভবতঃ আমাদের শোনবার জন্যই।রয় নিঃশব্দে আমার কাছে এগিয়ে এলো। ফিসফিস করে বললো, তুই এখানে থাক, আমি দেখছি। মনে রাখিস, জ্যাক প্যাটমোর–শেট নয়।

ও রান্নাঘরের খিড়কি দরজার দিকে এগিয়ে গেলো।

হঠাৎ লোলার স্বর শোনা গেলো, রিক্স কি প্যাটমোরের নামে আপনাকে কিছু বলেছে, শেরিফ?

হা–কেন বলুন তো?

কি বলেছে? প্যাটমোর ওকে মেরেছে? কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর শেরিফের জবাব কানে এলো-হ্যাঁ,এই প্যাটমোর লোকটা নাকি অকারণেই ওকে মেরেছে। তাছাড়া প্যাটমোরের স্বভাব চরিত্রও খুব

তাহলে আসল কারণটা রিক্স আপনাকে বলেনি দেখছি। প্যাটমোর কেন ওকে মেরেছে জানেন? রিক্স আমাকে বেশ্যা বলেছেবলে। লোলার কণ্ঠে অভিমানের সুর, প্যাটমোরের জায়গায় যদি আপনি হতেন তবে আপনিও রিক্সকে মারতেন, তাই না?

শেরিফ বললেন, আসল কথা কি জানেন, রিক্সের কথা আমি যে পুরোপুরি বিশ্বাস করেছি, তা নয়–এমন সময় খাবার ঘরের দরজা খোলার শব্দ পেলাম। পরক্ষণেই তোমার নামই জ্যাক প্যাটমোর?

হা-কি হয়েছে?

দরজার গায়ে কান পেতে একাগ্র চিত্তে শুনতে লাগলাম ওদের কথোপকথন, এরপর শেরিফ রয়কে কি প্রশ্ন করবেন কে জানে।

কিন্তু শেরিফের পক্ষে কেবলমাত্র রিক্সের বর্ণনা শুনে রয়কে চিনে ফেলা অত্যন্ত কঠিন হবে। কারণ বর্তমানে গোঁফ রাখার ফলে, আমার এবং রয়ের চেহারা প্রায় একই রকম দাঁড়িয়েছে। সুতরাং রয়কে প্যাটমোর বলে ভুল করা শেরিফের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক।

শেরিফ গম্ভীর স্বরে রয়কে প্রশ্ন করলেন, রিক্স বলছিলো,তুমিনাকি কাল ওকে মেরেছো-সত্যি নাকি?

লোলা অত্যন্ত চতুরভাবে রয়কে ঘটনার সূত্র ধরিয়ে দিলো। শেরিফের কথা শেষ হতে না হতেই ও বলে উঠলো, এইমাত্র শেরিফকে বলছিলাম, রিক্স আমাকে বেশ্যা বলে গালাগাল দিয়েছে, বলেই তুমি ওকে মেরেছে!

হ্যাঁ, মেরেছি! রয় হালকা স্বরেই জবাব দিলো, এবং আর একটা কথা আপনাকে বলে রাখি শেরিফ-রিক্স যদি আবার এখানে কোনদিন আসে, তাহলে শুধু যে ওকে মারবো তা নয়, পা দুটো একেবারে ভেঙেই দেবো।

শেরিফ হঠাৎ এক অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসলেন, এখানে চাকরিতে ঢোকার আগে তুমি কোথায় থাকতে, প্যাটমোর!

রয় বেশ ব্যঙ্গের সুরেই উত্তর দিলো, ওকভিল, ক্যালিফোর্নিয়া। শুনুন শেরিফ, আমাদের গ্রামে কোনো ভদ্রঘরের মেয়েকে রিক্সের মতো কোনো ছুঁচো যদি গালাগালি দেয় তবে আমরা তা সহ্য করি না। যদি মনে করেন, আপনি আমার হাতের ছাপ নিতে পারেন

হয়েছে, তোমাকে আর বেশী চালাক সাজতে হবেনা। বিরক্ত স্বরে শেরিফ রয়কে বাধা দিলেন, এ অঞ্চলে কোনো নতুন লোক এলে, তার সম্বন্ধে আমার খবর রাখা প্রয়োজন বলেই জিজ্ঞেস করছি।

লোলা হঠাৎ অযাচিতভাবে বলে উঠলো লোহালক্কড়ের ব্যবসার মাধ্যমে কার্লের সঙ্গে প্যাটমোরের পরিচয় হয়। তারপর কালই ওকে এখানে নিয়ে আসে।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর শেরিফ উত্তর দিলেন, সবই মানলাম, কিন্তু প্যাটমোর, তুমি একটু সাবধানে থেকো, একটা ঘুষি খরচা করার আগে দশবার ভেবে দেখবে, বুঝলে?

রয় একটু রুক্ষ স্বরে জবাব দিলো, আপনি তাহলে রিক্সকেও বলে দেবেন–কোন কথা বলার আগে যেন একশোবার ভাবে।

ঠিক আছে, রিক্সকে আমি সাবধান করে দেবো।

লোলা বিরক্ত স্বরে বললো, ওকে আরও বলবেন, এদিকে যেন আর না আসে। জর্জ সব সময়েই কেবল টাকার জন্য আমাকে জ্বালাতন করে।

হ্যাঁ, আমি জানি, মিঃ জেনসনও আমাকে অনেকবার এই কথা বলে ছিলেন। রিক্স নাকি টাকার জন্য দিনরাত তাকে জ্বালাতন করে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর শেরিফের সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠস্বর কানে এলো, মিঃ জেনসন আপনাকে ছেড়ে চলে গেছেন শুনে আমি আন্তরিক দুঃখিত। একটু কাশলেন শেরিফ, আশা করি অল্পদিনের মধ্যেই মিঃ জেনসন তার ভুল বুঝতে পারবেন।

কিন্তু লোলার নিস্পৃহ স্বর শেরিফকে নিরাশ করলো, সে নিয়ে আপনি আর ভেবে কি করবেন। কাল যদি আমাকে ছেড়ে সুখে থাকতে পারে, আমিও পারবো।

সে তো খুব ভালো কথা। কিন্তু শেরিফের কথার সুরে তা মনে হলো না, তবে মিঃ জেনসন যে এ জায়গা ছেড়ে চলে যাবেন ভাবতেই পারিনি–শুনেছি এখানেই নাকি তাঁর জন্ম হয়েছিলো।

এতোক্ষণ ধরে শেরিফের কথা শুনে লোলা বোধ হয় বিরক্ত হয়ে উঠছিলো, তাই শেরিফের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বললো, অনেক দিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা হলো, শেরিফ। সময় সুবিধা পেলেই এদিকে চলে আসবেন–

শেরিফও বললেন, আপনার কোনো প্রয়োজন পড়লেই আমাকে খবর দেবেন। মিসেস জেনসন-কোনো দ্বিধা করবেন না।

ধন্যবাদ।

শেরিফ বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

এতক্ষণ পরে ভয় ও উত্তেজনা কেটে গিয়ে অনেকটা স্বস্তি পেলাম। একটু পরেই লোলা আর রয় রান্নাঘরে এসে ঢুকলো।

তুই আমাকে বাঁচিয়েছিস। আনন্দে রয়ের হাত চেপে ধরলাম তুই না থাকলে আজ কি যে হোত

তুমি মিছিমিছি ভয় করছিলে, লোলা অধৈর্যভাবে বলে উঠলো; তোমাকে তো বলেছিলাম, শেরিফকে আমিই সামলাবোE

রয় আমার পক্ষ নিয়ে উত্তর দিলো, তা হোক, আমি যদি শেট হতাম, তবে আমিও ভয় পেতাম। তাছাড়া শেটের ভয় পাওয়ার যথেষ্ট কারণও ছিলো।

রয় দরজার দিকে পা বাড়ালো।

আমি ওকে বললাম, সত্যি রয় তোর জন্যই আজ এই বিপদের হাত থেকে

রয় থমকে ঘুরে তাকালো, তুই এমনভাবে বলছিস, যেন তুই আমার জন্য কোনদিন কিছু করিসনি।–আরে শালা, কৃতজ্ঞতা বোধ বলেও তো কিছু একটা আছে।

ও চলে যেতেই লোলার কাছে গেলাম। কিছুক্ষণ চুপচাপ ওকে লক্ষ্য করলাম, তারপর বললাম, আজ রাতে আমার আর সিনেমায় যাওয়া হবে না, লোলা।

লোলা ভুরু কুঁচকে আমার দিকে ফিরে তাকালো, তার মানে?

আমি আজ আর ওয়েন্টওয়ার্থে যাবো না।

কেন?

বুঝতেই তো পারছ। শেরিফ যদি হঠাৎ আমাদের দেখে ফেলেন, তবে? ওর নির্বুদ্ধিতায় আমার ভীষণ রাগ হলো, শেরিফ এখন জানেন রয়ই প্যাটমোর। তাহলে তার সঙ্গে দেখা হলে আমার পরিচয় কি দেবো?

লোলা বললো, ঐ পেটমোটা শেরিফটার সঙ্গে দেখা হওয়ার ভয়ে তুমি ওয়েন্টওয়ার্থে যাবে না? এর কোনো মানে হয়?

তুমি বুঝতে পারছে না–শেরিফের মাথায় যদি একবার ঢোকে, এখানে কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে, তাহলে বিপর্যয়ের আর কিছু বাকি থাকবে না।

গলার স্বর নীচু করে লোলাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, মনে করো যদি ও জেনসনের দেহ খুঁজে পায়? তখন তুমি কি করবে? পারবে এমন নিশ্চিন্ত থাকতে? আমি জানি তুমি পারবে না। কারণ জেনসনকে তুমিই গুলি করেছে।

তাই বুঝি? তোমার ঐ শেরিফ সেটা প্রমাণ করতে পারবে?

অবাক চোখে লোলার দিকে চেয়ে রইলাম। মনে মনে কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করলাম। লোলা বলে কি?

যাক এসব কথা বাদ দাও আমরা দুজনেই যখন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি, তখন দুজনকেই সাবধানে থাকতে হবে। তুমি চাইলেও কোনো ঝুঁকি আর নিতে পারবো না।

লোলা নিস্পৃহ ভাবে বললো, আমি তাহলে একাই যাবো। ওর কথার মধ্যে একটা চাপা অভিমান লক্ষ্য করলাম। মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালো। ওর সবুজ চোখ দুটো যেন পাথরে খোদাই করা–বরফের মতো শীতল, নিপ্রাণ।

শেট আজ রাতে বাংলোয় আমি একা থাকতে চাই। তুমি রয়ের ঘরে থেকো।

শোনো লোলা

আমি কি বলেছি, তা আশা করি বুঝতে পেরেছো? তুমি হয়তো ভুলে গেছো, আমিই এ জায়গাটার মালিক–তুমি নও। রয়ের সঙ্গে তোমার যখন এতই বন্ধুত্ব তো যাও–ওর কাছে গিয়ে রাত কাটাও।

লোলার চোখের তারায় অতলান্ত ঘৃণার ছায়া। মনে মনে শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। বিশ্বাসই হতে চাইলো না, লোলা আমাকে এই কথাগুলো বলছে।

রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। সশব্দে বন্ধ করে দিলাম ঘরের দরজা।

লোলার সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতার সেই দিনই শেষ হলো। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, রয়ের সদা হাস্যময় উপস্থিতি, আমাকে ভুলিয়ে দিলো এই বিচ্ছেদের কথা। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রতি রাতে যখনই বাংলোয় গেছি অনুভব করেছি জেনসনের অশরীরী উপস্থিতি। লোলার

মোহময়ী সান্নিধ্য আর তত ভালো লাগেনি। জেনসনের বিছানায় শোওয়ামাত্রই মনে হয়েছে, যেন অনধিকার প্রবেশ করেছি। কিন্তু পরক্ষণেই লোলার উষ্ণ আলিঙ্গনে পারিপার্শ্বিক পৃথিবী লুপ্ত হয়েছে মনের আকাশ থেকে।

তবু রোজ রাতে বাংলোয় ঢুকবার সময় কখনোকখনো মনে হয়েছে ফিরে যাই।সুতরাং লোলার সিদ্ধান্ত একরকম আমাকে খুশিই করলো। জিনিসপত্র সব বাংলো থেকে সরিয়ে রয়ের ঘরে নিয়ে তুললাম। রয় আমার অবস্থা দেখে ঠাট্টা করতে ছাড়লো না।

সারাটা দিন লোলা মুখ গোমড়া করে থাকলো। আমার সঙ্গে একটা কথাও বললো না। বেলা দশটার সময় ও গাড়ি নিয়ে ওয়েন্টওয়ার্থে চলে গেলো। লোলা চলে যাওয়ার পর বাংলো থেকে আমার অবশিষ্ট জিনিসপত্রগুলো নিয়ে এলাম। কাজ করতে করতে মনে মনে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছি। ভেবেছি, দু-এক দিনেই লোলা ওর ভুল বুঝতে পারবে– আমার কাছে আবার ফিরে আসবে।

রয় বাইরে একটা গাড়ি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় বাংলোয় আমি একাই ছিলাম। হঠাৎ ৪৫ রিভলবারটার কথা মনে পড়ায় ড্রয়ারের কাছে গেলাম। একেবারে ওপরের ড্রয়ারটা খুলতেই চমকে উঠলাম। চোখের সামনে যেন একটা কালো পর্দা নেমে এলো।

মনে মনে ভাবলাম একমাত্র লোলা ছাড়া ওটা কেই বা নেবে! সুতরাং সারা ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। যেন রিভলবারটার ওপরেই নির্ভর করছে আমার জীবনমরণ!

সারা বাংলো তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ওটার কোনো সন্ধান পেলাম না। রিভলবারটা যেন সম্পূর্ণ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। কিন্তু রিভলবারটায় লোলার কি প্রয়োজন বুঝতে পারলাম

না। নিতান্তই উদ্দেশ্যহীন ভাবেই কি ও ৪৫টা সরিয়েছে। বাকি দিনটুকু এই রিভলবারের চিন্তাতেই কেটে গেলো। কাজ করতে করতেও খালি ভেবেছি ৪৫ টার কথা। খুঁজেছি, ওটাকে সরানোর কোনো যুক্তিসঙ্গ ত কারণ–কিন্তু সবই বৃথা। চোখের সামনে ভেসে উঠেছে লোলার ঘৃণাভরা কুটিল চোখ। মনে হয়েছে, আমাদের অন্তরঙ্গতার দিনগুলো সব মিথ্যে স্বপ্ন। লোলা আমার সঙ্গে অভিনয় করে আমাকে বোকা বানিয়েছে।

রাত একটা পর্যন্ত রয়ের সঙ্গে বাইরেই কাটালাম। কিন্তু লোলার ফিরবার কোনো লক্ষণই দেখা গেলো না। অবশেষে কিছুটা হতাশ হয়েই রয়কে নিয়ে ঘরে ফিরে চললাম।

আমার বিছানা ঠিক জানলার পাশে। রাত প্রায় তিনটের সময় একটা গাড়ির শব্দ কানে আসায় জানলা দিয়ে উঁকি মারলাম। দেখি, লোলার মার্কারি বাইরে বালির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আর লোলা বাংলোর দিকে চলেছে। ইচ্ছে হলো এক্ষুনি গিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করি, রিভলবারটার কথা কিন্তু রাতে আর না গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে লোলা যখন খাবার ঘরে এলো, তখন এগারোটা বাজে। লোলাকে একা পেয়েই জানতে চাইলাম রিভলবারটা কোথায়!

লোলা স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো, ওটা আমি লুকিয়ে ফেলেছি।

কোথায়?

ওয়েন্টওয়ার্থ যাবার পথে রাস্তায় পুঁতে ফেলেছি। কেন তোমার কি সন্দেহ হচ্ছে?

কেন? পুঁতে ফেলেছো কেন?

তোমার তো কারণটা বোঝা উচিত শেট, পুলিশ যদি রিভলবারটা খুঁজে পেতো, তাহলে কি আমাকে ছেড়ে দিতো মনে করেছো? ওরা সহজেই বুঝতে পারতো, ঐ রিভলবারের গুলিতেই কার্ল মারা গেছে তাই না?

লোলার কথাগুলো যুক্তিসঙ্গত হলেও তবুও কোথায় যেন একটা খটকা লাগছে। বারে বারে মনে হচ্ছে ও যেন মিথ্যে বলছে। লোলা আমাকে আরো জানালো যে, ও এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে চায়। এবং এখানকার দেখাশোনার ভার ও আমার ওপরে দিয়ে যেতে চায়।

আমি সব শুনে ওকে বললাম, তুমি একটা কথা ভুলে যাচ্ছো লোলা, এখানকার প্রতিটি পুলিশ ফাঁড়িতে আমার চেহারার বিবরণ–এমন কি ফটো পর্যন্ত রয়েছে। তুমি চলে গেলে আমার পক্ষে নিরাপদে থাকা অসম্ভব। সুতরাং এ জায়গা ছেড়ে যাওয়া তোমার হবে না।

লোলার চোখ হায়নার মতো জ্বলজ্বল করে উঠলো, কার্লের সিন্দুক তোমাকে খুলতেই হবে শেটকারণ আমার টাকা আমি চাই। টাকা পেলেই আমি এ সপ্তাহের শেষে পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন ছেড়ে চলে যাবো। দেখা যাক কে আমাকে বাধা দেয়।

আমি ওকে বললাম, ওসবে কোনো লাভ হবে না। এ জায়গা তুমি তিনটে কারণে ত্যাগ করতে পারবে না।

প্রথমতঃ, এখানে সব সময় আমাকে আত্মগোপন করে থাকতে হবে। তুমি যদি চলে যাও তাহলে সবাই মনে করবে রয় একাই এ জায়গা দেখাশোনা করছে। আর তাতে শেরিফ যদি সন্দেহ করে বসে, তবে অবাক হওয়ারও কিছু নেই। তারপর শেরিফ এসে আমাকে দেখলেই ষোলোকলা পূর্ণ হবে।

দ্বিতীয়তঃ জেনসনের মৃতদেহ আশেপাশেই কবর দেওয়া হয়েছে। পুলিশ যদি খোঁড়াখুঁড়ি করে মৃতদেহ খুঁজে পায় তবে তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তোমাকে জেলে গিয়ে ঘানি ঘোরাতে হবে। কারণ কার্লকে গুলি যখন তুমিই করেছে, তার ফলও তোমাকেই ভোগ করতে হবে। আর তৃতীয়তঃ সিন্দুক আমি খুলছি না–এবং টাকাও তুমি পাবে না। কারণ, টাকা পেয়ে গেলেই তুমি আমার বিপদ ডেকে আনবে। হয়তো পুলিশকে বলবে, জেনসনকে আমিই খুন করেছি। কিন্তু এ কথাটা তুমি যাতে পুলিশকে না বলতে পারো সেদিকে আমি বিশেষ যত্ন নেবো, বুঝেছো?

আমি বুঝতে পারলাম যে, আমার উত্তরের প্রতিটি শব্দ মিছরির ছুরির মতো লোলার গায়ে কেটে বসেছে। দেখলাম লোলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। গায়ের রঙ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, চোখে অন্ধকারের ছায়া, মুখে কষ্টকৃত প্রশান্তির ভাব। আমার দিকে তাকিয়ে ও বললো, তোমাকে একটা কথা জানিয়ে রাখা ভালো। অধৈর্য হওয়ার মতো ছেলেমানুষ আমি নই। এ জায়গা ছেড়ে আমি চলে যাবোই। আর যখন যাবে তখন তোমার হয়তো দুঃখ হবে তোমার পরিণতির কথা ভেবে। হয়তো মনে হবে, আমাকে এখন যেতে দিলেই তুমি ভালো করতে

তুমি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছো লোলা? তবে শোনো রয় যে কার্লের সিন্দুক খুলতে পারবে না, তা নয়। কিন্তু ভুলক্রমেও ওকে দিয়ে সিন্দুক খোলানোর কথা চিন্তা করো না। কারণ, রয় যদি সিন্দুক খুলে দেখে ওতে কি আছে, তবে সমস্ত টাকা ও-ই নিয়ে নেবে। এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। ভেবো না ও তোমার যৌবনের মায়াজালে ধরা দেবে। তা যদি হতো তবে আমি রয়কে এখানে চাকরি দিতাম না। ওকে আমি ছেলেবেলা থেকেই চিনি। মেয়েদের উপস্থিতিই রয়ের কাছে অসহ্য এবং বিরক্তিকর। তুমিও তো কয়েকবার চেষ্টা করে দেখেছো, কোনো লাভ হয়েছে কি? রয়ের জীবনে সবচেয়ে প্রথমে যার স্থান, তা হলো টাকা। সিন্দুক খুলে টাকাগুলো দেখলেই তোমাকে খুন করবে। তারপর সমস্ত টাকা নিয়ে চলে যাবে। ও টাকা তুমি আর কোনোদিন পাবে না। সুতরাং তোমার যদি এতোই টাকার প্রয়োজন থাকে, তবে যাও-রয়কে সিন্দুক খুলতে বল।

কথা শেষ করে বাইরে পা বাড়ালাম। লোলা তখনও একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

বাইরে এসেই রয়-এর সঙ্গে দেখা। মনে মনে ভাবলাম সত্যিই কি রয়কে বিশ্বাস করা চলে! ও যদি এততদিনকার সংযম ভুলে লোলার যৌবনের ফাঁদে পা দেয়। কিন্তু ওর নির্বিকার, কঠোর ভাব আমাকে আশ্বস্ত করলো। মনে হলো রয়কে আমি বিশ্বাস করতে পারি।

আমি রয়কে বললাম, আমার কি মনে হয় জানিস, এবার লোলা হয়তো তোর সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করবে। তোকে আগে থেকেই জানিয়ে রাখলাম। দেখিস, সাবধানে থাকিস।

এবার মনে হলো, রয়কে সিন্দুকের কথা বলে দিই। কিন্তু মনে হলো রয় যদি একবার জানতে পারে সিন্দুকে কি আছে, তবে ওর পক্ষে স্থির থাকা মুস্কিল হবে। হয়তো সিন্দুক খোলার জন্য আমাকেই চাপ দেবে। আর যাই করি, সিন্দুক আমি খুলছি না।

রয় আপন মনেই মাথা নাড়লো, ওঃ, মেয়েদের পক্ষে সবই সম্ভব।

পর পর তিনটে দিন লোলা একাই কাটালো। আমার সঙ্গে কথাবার্তা একেবারেই বন্ধ করে দিলো। তাতে আমার খুব একটা অসুবিধা হয়নি, কারণ রয়ই হলো আমার সর্বক্ষণের সাথী।

রোজ রাতে বাইরের উঠোনে আমরা তাস খেলে সময় কাটাতাম। মাঝে মাঝে প্রয়োজন হলে খেলা ছেড়ে উঠে গিয়ে গাড়িতে তেল মোবিল দিয়ে আসতাম।

খেলতে খেলতে ও প্রায় টাকা পয়সা নিয়ে আলোচনা করতো,বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখতো।

আমি ওকে অনেক বোঝাতাম বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন, টাকার লোভ ইত্যাদি ত্যাগ করতে। কিন্তু ওর মাথায় সেই একই চিন্তা ঘুরে বেড়াতে।

সেদিন লক্ষ্য করলাম খেলার প্রতি ওর একেবারেই মন নেই। হঠাৎ ও টেবিলের ওপর তাস ছড়িয়ে দিয়ে বলল, আজ আর খেলবো না খুব ক্লান্ত লাগছে। যাই শুয়ে পড়ি।

আজ রাতে কাজ করবার দায়িত্ব আমার। গাড়ির ভিড় কমলে আমরা এক সঙ্গেই শুতে যাই। কিন্তু আজ এই প্রথম রয় একা শুতে যাচ্ছে।

রয় বিদায় নিয়ে চলে গেলো। চুপচাপ বসে লক্ষ্য করতে লাগলাম। একটু পরেই ওর ঘরের আলো জ্বলে উঠলো। চোখ ফিরিয়ে দেখি, বাংলোয় লোলার ঘরে তখনও আলো জ্বলছে।

দুটো আলোকিত জানলা আমার কাছে বয়ে নিয়ে এলো এক অনুচ্চারিত ইঙ্গিত। মনে হলো রয় হঠাৎ যেন আমার বিপক্ষে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আর আমি এখানে বড় একা।

আশঙ্কা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন

১২.

রয় সম্বন্ধে আমার গত রাতের আশঙ্কা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, পরদিন সকালেই সেটা বুঝতে পারলাম। কারণ আমার চোখে পড়লো ওর ব্যবহার আগের মতোই হাসিখুশী ও উজ্জ্বল।

প্রতিদিনের মতো আজও সন্ধ্যেবেলা আমরা তাস নিয়ে বসলাম। নিজেদের মধ্যে হার জিত নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কিও করলাম। নানা রকম ব্যাপার নিয়ে আলোচনাও করলাম। রয় আবার ওর হাসিখুশী মেজাজ ফিরে পাওয়ায় অনেকটা স্বস্তিবোধ করলাম। এছাড়া নিশ্চিন্ত হওয়ার আরও অনেক কারণ ছিল যেমন–আমার প্রতি লোলার ব্যবহার আবার ধীরে ধীরে সহজ হয়ে উঠেছে। সারাদিনে লোলা আমার সঙ্গে বার দুয়েক কথা বলেছে, যদিও ব্যবসা সংক্রান্ত। তবুও আমি খুব খুশী।

রাত প্রায় দশটার সময় লোলা বারান্দায় এসে আমাদের খেলা দেখতে লাগলো। আমরা ওকে দেখে ডাকলাম। কিন্তু ও এলোনা, শুতে চলে গেলো। যাবার আগে বলে গেলো যে ওয়েন্টওয়ার্থে গিয়ে আগামীকাল কিছু কেনাকাটা করার আছে। আমাদের দুজনের মধ্যে কেউ একজন সঙ্গে গেলে ভালো হয়।

আমি একটু অবাক হলাম। কারণ, এ পর্যন্ত কেনাকাটার ব্যাপারগুলো লোলা একাই সেরেছে। তাই আজ ওর এই অনুরোধে মনের মধ্যে সন্দেহের দোলা লাগলো। এর পেছনে কি লোলার কোন উদ্দেশ্য আছে?

রয় আমাকে জানালো যে আমার যদি কোনো অপত্তি না থাকে তাহলে ও লোলার সঙ্গে ওয়েন্টওয়ার্থে যেতে চায়। কারণ ওরও কিছু কেনাকাটা আছে।

আমি মনে মনে চমকে রয়-এর দিকে তাকালাম। মুখে বললাম, ঠিক আছে যাবি তো যা না। তবে দুপুরের আগেই ফিরে আসার চেষ্টা করিস। নাহলে আমি একা সবকিছু সামলাতে পারবো না।

আমি কিন্তু সকাল আটটায় যাবো। বিদায় জানিয়ে লোলা বাংলোয় ফিরে গেলো।

লোলার সঙ্গে রয়-এর যাওয়াটাকে আমি কিছুতেই সহজভাবে মেনে নিতে পারছি না। কারণ আমি নিশ্চিত, সুযোগ পেলেই লোলা ওর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করবে। তার ওপর এখান থেকে ওয়েন্টওয়ার্থে যাবার কুড়ি মাইল রাস্তা লোলা চুপচাপ বসে কাটাবে বলে তো মনে হয় না।

রয় জানালো যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে কিছু কেনাকাটি করেই ফিরে আসবে।

পরদিন সকালে দেখলাম রয় আর লোলা মার্কারি নিয়ে রওনা হচ্ছে। ওরা চলে যাওয়ার পর নিঃসঙ্গতাবোধ আমাকে আঁকড়ে ধরলো। মনের কোণায় ঘুরতে লাগলো একই সন্দেহ, একই আশংকা।

এসব চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য স্টেশন ওয়াগনের ইঞ্জিন নিয়ে কাজে লেগে গেলাম।

এই সময় হঠাৎ দেখলাম, একটা বড় ট্রাক তেল নেবার পাম্পগুলোর কাছে এসে দাঁড়ালো। ট্রাকে সার বেঁধে সাজানো বড় বড় কাঠের প্যাকিং বাক্স। ট্রাকচালক একজন মোটাসোটা বয়স্ক– লোক। মাথায় সোনালী চুলের কোথাও কোথাও শুভ্রতার আভাস। মাথায় একটা স্টেটসন হ্যাট।

ট্যাঙ্কে তেল দিচ্ছি, ড্রাইভারটা হঠাৎ ট্রাক থেকে নেমে এলো। একটা ময়লা রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে লোকটা কৌতূহল ভরে আমার দিকে তাকালো। তুমি বোধহয় এখানে নতুন এসেছে, তাই না?–তা জেনসন গেলো কোথায়?

আমি লক্ষ্য করলাম, জেনসনের মতো এ লোকটাও সুইডেনের অধিবাসী। সুতরাং এ যদি জেনসনের বন্ধুও হয়, তবে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। সেই কারণে খুব সাবধানে ওকে জেনসনের অ্যারিজোনায় যাওয়ার গল্পটা শোনালাম।

আমার গল্পটা শুনে লোকটির মুখের রেখা কঠিন হয়ে উঠলো, চোখ দুটো হয়ে উঠলো সংকীর্ণ।

জেনসন কোনদিন এ জায়গা ছেড়ে গেছে বলে তো মনে পড়ে না। জানো গত বিশ বছর ধরে আমি এ রাস্তায় নিয়মিত যাতায়াত করি। যতবারই গেছি কার্লের সঙ্গে প্রতিবারই

আমার দেখা হয়েছে–অ্যারিজোনায় নতুন পেট্রলপাম্প খুলে ওর যে কি সুবিধা হবে কে জানে!-তাহলে কি ও আর এখানে ফিরবে না।

হ্যাঁ, ফিরবেন। এখানকার সবকিছু গোছগাছ করার জন্য তাকে একবার আসতে হবে।

পেট্রল ট্যাঙ্কের ঢাকনা লাগাচ্ছি। লোকটা হঠাৎ এক অদ্ভুত প্রশ্ন করলো, তুমি কি কার্লের বউ এর পরিচিত কেউ?

না, আমি এখানে চাকরি করি। কিন্তু কেন বলুন তো?

না-বলছিলাম–জেনসনের বউ-এর স্বভাব চরিত্র খুব একটা ভালো নয়। যখন প্রথম মেয়েটাকে দেখলাম যে জেনসনকে বিয়ে করে এখানে বসে আছে–তখন ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম।

মেয়েটাকে আমি আগে থেকেই চিনি। লোকটি একটি সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো, বছর পাঁচেক আগেকার কথা। তখন মেয়েটা কারসন সিটিতে থাকতো। ফ্রাঙ্ক ফিনি নামে একটা লোককে ও বিয়ে করেছিলো। ফিনি একটা গাড়ির কারখানা দেখাশোনা করতে, আর সেই সঙ্গে একটা স্ন্যাক-বারের ম্যানেজারও ছিলো। জানো, শেষ পর্যন্ত কি হল?

–একদিন ফিনিকে স্ন্যাক বারে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেলো। ওর ডান হাতে ধরা ছিলো একটা রিভলবার। আর মাথাটা ফেটে চুরমার হয়ে সারা মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছিলো। লোলার বক্তব্য ও নাকি ওপরের ঘরে কাজেই ব্যস্ত ছিলো। এমন সময় নীচের তলা

থেকে রিভলবারের বিকট শব্দ ওর কানে আসে। তারপর ও নীচে এসে দেখে ফিনি মরে পড়ে আছে। কাউন্টারের ওপর। যে ক্যাশবাক্স ছিলো তা থেকে প্রায় দু-হাজার ডলার অদৃশ্য হয়েছে। পুলিশের ধারণা সেই টাকাগুলো লোলাই নিয়েছে। অথচ তার বিপক্ষে কোনো প্রমাণ দাখিল করা গেলো না।

একজন অফিসার সন্দেহ করলো লোলাই হয়তো ফিনিকে গুলি করেছে। কারণ ওরা নাকি প্রায়ই এটা-সেটা নিয়ে তুমুল ঝগড়া করতো। কিন্তু সেটাও পুলিশ প্রমাণ করতে পারলো না।

এ ঘটনার কিছুদিন পরে লোলা কারসন সিটি ছেড়ে কোথায় যেন চলে গেলো। তাহলেই বুঝে দেখো, যখন দেখলাম ও এখানে এসে জেনসনের মতো একজন ভালো লোককে বিয়ে করে বসেছে তখন স্বাভাবিক ভাবেই ভীষণ অবাক হলাম।

এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে লোকটার কথা শুনছিলাম। কারণ লোলার অতীত ইতিহাস আমার কাছে অমূল্য। চোখে মুখে বিস্ময় ফুটিয়ে বললাম, আশ্চর্য, আমি তো কিছুই জানতাম না। যাই হোক। আমি লোকটাকে বললাম, আমি যতদূর জানি, মিঃ জেনসন মিসেস জেনসনকে নিয়ে বেশ সুখেই আছেন। আপনার এই কথাগুলো মিঃ জেনসনের কানে গেলে তিনি হয়তো খুব অসন্তুষ্ট হবেন। অতএব এ নিয়ে আর বেশী আলোচনা না করাই ভালো।

জেনসন তাহলে ওর বউকে নিয়ে সুখে আছে বলছো?

লোকটা যেন আমার কথা বিশ্বাসই করতে পারছে না।

কথা শেষ করে লোকটা তেলের দাম বাবদ কয়েকটা নোট আমার দিকে এগিয়ে ধরলো, আর বললো, আমি যেন জেনসনের কাছে এই সমস্ত কথা না বলি।

লোকটি ট্রাকে উঠে পূর্ণ গতিতে ট্রাক ছুটিয়ে দিলো।

লোকটির কথাগুলো আমাকে বেশ আতঙ্কগ্রস্ত করলো। ছুটন্ত ট্রাকটার দিকে তাকিয়ে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম।

মনের মধ্যে চিন্তার ঝড় বয়ে চললো। তাহলে লোলা আগেও একবার বিয়ে করেছে। ওর স্বামী মারা গেছে রিভলবারের গুলিতে। আর সেই সঙ্গে অদৃশ্য হয়েছে দু হাজার ডলার। এ কথা ভাবতেই হৃৎপিণ্ডটা কে যেন খামচে ধরলো।

জেনসনও তো মারা গেছে রিভলবারের গুলিতে। আর আমি যদি সিন্দুকের দরজা বন্ধ করে না দিতাম তাহলে অদৃশ্য হত ঐ একলাখ ডলার।

এই ঘটনা দুটোর মধ্যে কি কোনো যোগসূত্র আছে! সন্দেহ-আতঙ্কের সুতোয় মনটা দুলতে লাগলো পেন্ডুলামের মতো।

ঐ ট্রাক ড্রাইভারটার কথা যদি সত্যি হয়, তবেকারসন সিটির পুলিশ লোলাকে শুধু টাকা চুরির জন্যই সন্দেহ করেনি ফিনিকে খুন করার জন্যও সন্দেহ করেছে। তার মানে– লোলা কি জেনসনকে খুন করেছে?

মনকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলাম সেই ভয়াবহ রাতের দৃশ্যে। সবকিছু আবার যেন আমার চোখের সামনে নিখুঁতভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। পরিষ্কার দেখতে পেলাম, লোলা রিভলবার উচিয়ে বসবার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। উত্তেজনায় ওর বুক উঠছে নামছে। তারপরই শুনতে পেলাম লোলার সেই অবিশ্বাস্য কর্কশ শাসানি। মনে পড়লো, জেনসনের উঠে দাঁড়ানোর কথা। রাগে চোখমুখ লাল করে ও লোলার দিকে এগোতে গেলো। সঙ্গে সঙ্গেই আবার যেন শুনতে পেলাম সিন্দুকের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ- লোলার সেই হিংস্র দৃষ্টি বন্দুকের বিকট আওয়াজ!

এতোদিন ধরে ভেবে এসেছি সিন্দুকের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে লোলা চমকে ওঠায়, ট্রিগারে আচমকা চাপ পড়ে গুলি বেরিয়ে গেছে। আর তাতেই জেনসন মারা গেছে। এক আকস্মিক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। এখন ঐ লোকটার কথা শোনার পর আবার নতুন করে ভাবতে শুরু করলাম।

প্রথম স্বামীকে খুনের ব্যাপারে পুলিশ লোলাকে সন্দেহ করেছিলো তাহলে কি জেনসনকে লোলা নৃশংসভাবে খুন করেছে।

কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটাকে আকস্মিক দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। ব্যাপারটা যদি সত্যিই খুন হয়, তাহলে ও তো অনায়াসেই খুনের দায়টা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারতো। তারপর হঠাৎ একটা বিচিত্র সম্ভাবনা আমার সমস্ত চিন্তাশক্তি পরিবর্তন করে দিলো। হৃৎপিণ্ডের গতি স্তব্ধ হয়ে এলো।

সেদিন লোলা যখন রিভলবার হাতে ঘরে এসে ঢোকে, তখন সিন্দুকের দরজা খোলাই ছিলো। তাহলে কি লোলার উদ্দেশ্য ছিলো জেনসনের পর আমাকে গুলি করে সিন্দুকের টাকা গুছিয়ে নেওয়া? হয়তো আগে থেকেই সবকিছু প্ল্যান করে রেখেছিলো। লোলার গুলিতে আমি আর জেনসন মারা গেলে পর, ও হয়তো টাকাগুলো লুকিয়ে ফেলে পুলিশে খবর দিতো। তারপর পুলিশ এলে ফ্র্যাঙ্ক ফিনির সময় যে রকম গল্প শুনিয়েছিলো, এবারও সেরকম কিছু একটা শোনাতো।

লোলার এই নিখুঁত প্ল্যান বানচাল হয়ে যাওয়ার একটাই যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। তা হলো জেনসনকে গুলি করা মাত্রই আমি সিন্দুকের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। সেই মুহূর্তেই লোলা বুঝতে পেরেছিলো, ও যদি আমাকে তখন গুলি করে, তবে সিন্দুক চিরকাল বন্ধই থেকে যাবে। কারণ আমি ছাড়া সিন্দুক খোলার লোক এই জায়গায় আর নেই। তাই সঙ্গে সঙ্গে ও এমন অভিনয় করেছে, যেন আচমকা গুলি বেরিয়ে জেনসন মারা গেছে। তারপরই লোলা যখন বুঝতে পারলো, ব্ল্যাকমেল করে আমাকে দিয়ে সিন্দুক খোলানো যাবে না, তখন ও অন্য রাস্তা ধরলো। এমন ভাব দেখালো যেন ও আমাকে ভালোবেসে ফেলেছে। কিন্তু ওর ফাঁদে আমি পা দিইনি।

আর যখনই ও বুঝতে পেরেছে যে এই পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন-এ সিন্দুক খোলার লোক আর আমি একা নই, তখনই আমার প্রতি ওর ব্যবহার রূঢ় হয়ে উঠেছে। যেহেতু রয়ও এখন সিন্দুক খুলতে জানে। তাই লোলা এখন রয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করছে।

আমি নিশ্চিন্ত হলাম যে, জেনসনের ৪৫ বর্তমানে লোলার কাছে, একথা ভাবতেই আমার গলা শুকিয়ে গেলো। অর্থাৎ আমার এবং রয়ের–দুজনেরই জীবন বিপন্ন। লোলা হয়তো

রয়কে যাহোক করে রাজী করিয়ে সিন্দুক খোলাবে। তারপর নির্বিকার চিত্তে ওকে খুন করবে। হয়তো আমাকেও আর জীবিত রাখবে না। পুলিশকেও সেই একই গল্প শোনাবে।

নাঃ,এর একটা বিহিত করা প্রয়োজন। লোলার চোখের রক্তলোলুপ হিংস্র দৃষ্টি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

লোলাকে জব্দ করার একটা মাত্র উপায় আছে তা হলো সিন্দুক থেকে সমস্ত টাকা অন্য কোথাও সরিয়ে সিন্দুক খোলা রেখে দেওয়া। কিন্তু ঐ টাকাগুলো লুকিয়ে রাখার জন্য আমাকে প্রথমেই ভালো দেখে একটা জায়গা খুঁজতে হবে। অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করে ফেললাম যে টাকাগুলো সিন্দুক থেকে নিয়ে জেনসনের মৃত দেহের সঙ্গেই কবর দেবো।

বারান্দা ছেড়ে বাংলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি হঠাৎ চোখে পড়লো একটা ট্রাক ওয়েন্টওয়ার্থের রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে। তার পেছনে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা পুরোনো প্যাকার্ড গাড়ি। প্যাকার্ডের ড্রাইভার অত্যন্ত খিটখিটে স্বরে জানালো, তার গাড়ি এখুনি ঠিক করে দিতে হবে না হলে ট্রপিকা স্প্রিংসে পৌঁছতে তার দেরী হয়ে যাবে। ঐ ঝরঝরে প্যাকার্ডের পেছনে আমার সময় নষ্ট হতে লাগলো, দুপুরবেলা রয় আর লোলা যখন ওয়েন্টওয়ার্থ থেকে ফিরে এলো, তখনও আমি ঐ হতচ্ছাড়া প্যাকার্ডের সঙ্গে রেঞ্চ নিয়ে যুদ্ধ করে যাচ্ছি।

এইভাবে তিন দিন তিন রাত কেটে গেলো। কিন্তু এর মধ্যে একবারও সিন্দুকের কাছে যাওয়ার সুযোগ পেলাম না।

লোলা সবসময় আমার আশেপাশে ঘুরঘুর করতে লাগলো। ও আজকাল আমার সঙ্গে কথা বলে ঠিকই, কিন্তু ওর নিস্পৃহ ব্যবহার সব সময় আমাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। অতীতের অন্তরঙ্গতার সূত্র ছিঁড়ে গিয়ে আমাদের মাঝখানে গড়ে উঠেছে এক সুদৃঢ় দ্বন্দ্বের পাঁচিল।

প্রথম প্রথম অসুবিধা হলেও এই অস্বস্তিকর পরিবেশকে আমি মেনে নিলাম। এবং কিছু দিনের মধ্যে অনুভব করলাম লোলাকে স্পর্শ করতেও আমার প্রচণ্ড অনীহা। লোলার প্রতি একে একে আমার ঘৃণা জন্মাতে শুরু করলো।

সবসময় ওকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগলাম। এক এক সময় মনে হয়েছে রয়কে সব কথা খুলে বলি। কিন্তু পরক্ষণেই কি মনে করে আবার চুপ করে গেছি।

রয় যদি জানতে পারে যে সিন্দুকে এক লাখ ডলার আছে তবে ওর বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে এবং ওকে ঠেকিয়ে রাখা খুব অসুবিধা হবে। সুতরাং মুখ বন্ধ করে দিন কাটাতে লাগলাম।

এই কঠিন সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হলো রয় ও লোলার অনুপস্থিতি। তাই বসে বসে দিন গুনতে লাগলাম কবে লোলা রয়-এর সঙ্গে ওয়েন্টওয়ার্থে যাবে আমাকে এই পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন-এ রেখে যাবে সম্পূর্ণ একা।

প্রায় সপ্তাহখানেক পরে এসে গেলো সেই প্রতীক্ষিত সুযোগ। একদিন সন্ধ্যায় খাবার ঘরে আমি আর রয় কাজে ব্যস্ত ছিলাম। এমন সময় লোলা ঘরে এসে ঢুকলো, ওয়েন্টওয়ার্থে

ব্রিজিত বার্দোর একটা ভালো ছবি এসেছে। আজ রাতে আমি দেখতে যাবো তোমরা কেউ যাবে?

রয় বললো যে সে মারপিটের ছবি ছাড়া দেখে না।

আমি ভেবে দেখলাম, এই সুযোগ। এখন যদি কোনরকমে রয়কে লোলার সঙ্গে যেতে রাজী করাতে পারি তবে আমার উদ্দেশ্য সফল হবে। কারণ, ওয়েন্টওয়ার্থে সিনেমা দেখে ফিরতে ফিরতে ওদের রাত তিনটে হয়ে যাবে। আর ঐ সময়টাকেই আমি কাজে লাগাবো।

আর রয়কে বললাম ছবিতে মারপিট না হয় নাই থাকলো, ব্রিজিত বার্দোকে তো দেখতে পাবি।

রয় অবাক চোখে আমার দিকে তাকালো। ও হয়তো ভেবেছিলো, আমিই লোলার সঙ্গে যাবো।

রয় ইতস্ততঃ করে জবাব দিলো ভাবছিলাম আজ একটু তাস খেলবো।

কিন্তু এই কুড়ি মাইল গাড়ি চালিয়ে লোলা একেবারে একা ওয়েন্টওয়ার্থে যাবেতাই বলছিলাম

লক্ষ্য করলাম লোলা একদৃষ্টে আমাকে দেখছে। ও হঠাৎ বলে উঠলো, ঠিক আছে তোমাদের যখন যাবার ইচ্ছা নেই, তখন আমি একাই যাবো।

রয় লোলার দিকে আড়চোখে চেয়ে হাসলো, আচ্ছা তোমার কথাই থাক। চলো কি ছবি দেখাতে নিয়ে যাবে

রয় আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে মাথা নোওয়ালো। লোলা প্রত্যুত্তরে হেসে বাংলোর দিকে পা বাড়ালো।

সাড়ে নটা বাজতে না বাজতেই লোলা সেজেগুজে বাংলো থেকে বেরিয়ে এলো। ওর পরনে একটা দুধ সাদা পোশাক। আগে কোনদিন ওকে এ পোশাকে দেখিনি।

লোলা যেন আজ প্রাণ ভরে সেজেছে। ওর রূপযৌবনের সমস্ত ছলাকলা প্রকট করে ও এগিয়ে চললো মার্কারির দিকে। ওর ভাবগতিক দেখে বুকের মধ্যে বেজে উঠলো বিপদের সংকেত।

লোলা ওর স্বভাবসিদ্ধ ছন্দে এগিয়ে গিয়ে রয়ের পাশে বসলো। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে রয় আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসলো।

শেট, আমি কিন্তু যেতে চাইনি। তুই বললি বলে তাই

লোলাকে আড়াল করে চোখ টিপলো রয়।

রয়ের মন্তব্য আমার কানে বাজলো। কারণ ওর চরিত্রের সঙ্গে এ ধরনের কথা ঠিক খাপ খায় না–কিন্তু ওর কথা আমি গায়েই মাখলাম না। মিষ্টি করে জবাব দিলাম, আশাকরি সময়টা তোর ভালোই কাটবে।

আমি ভালোভাবেই জানি যদি একবার সিন্দুকের টাকাটা পরিকল্পনামতো লুকিয়ে ফেলতে পারি, তবে লোলা আর রয় দুজনেই থাকবে আমার বুড়ো আঙুলের তলায় সম্পূর্ণ আমার আজ্ঞাধীন।

ওদের গাড়ি ছেড়ে দেবার পর কয়েক মুহূর্ত আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর বাংলোর দিকে চললাম।

বাংলোর কাছে পৌঁছেই লক্ষ্য করলাম সদর দরজা বন্ধ। বুঝলাম লোলা দরজায় তালা দিয়ে গেছে। সুতরাং গুমটিঘরের দিকে চললাম একটুকরো তারের সন্ধানে।

তারের মাথাটা সামান্য বেঁকিয়ে চাবির ফুটো দিয়ে ঢুকিয়ে দিলাম। একটু চেষ্টাতেই খুলে গেলো বাংলোর দরজা। তারপর হাঁটু গেড়ে সিন্দুকের কাছে বসলাম, খুলে ফেললাম সিন্দুকের দরজা। সিন্দুকের দরজা খোলামাত্রই নির্মম রসভঙ্গের মতো কানে এলো কোনো গাড়ির হর্নের শব্দ। জানলা দিয়ে উঁকি মারতেই দেখি পাম্পের কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটা হলদে ক্যাডিলাক।

অতএব কম্বিনেশন ডায়াল ঘুরিয়ে সিন্দুক বন্ধ করে বাইরে এলাম। কিছুটা হতাশ হয়েই গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেলাম–

সেই যে গাড়ি আসতে শুরু করলো ব্যস–সিন্দুক সিন্দুকের জায়গায় পড়ে রইলো, আর আমি অক্লান্ত ভাবে খেটে চললাম।

প্রায় বারোটা নাগাদ গাড়ি চলাচল একেবারে কমে এলো। নিশ্চিন্ত হয়ে উঠেদাঁড়ালাম। বাংলোর দিকে এগিয়ে যাবো এমন সময় চোখে পড়লো দূরাগত কোনো গাড়ির হেডলাইটের উজ্জ্বল আলো। একটু বিরক্ত হয়ে পাম্পের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

গাড়িটা একটা পুরোনো মডেলের বুইক। গাড়ির আরোহী দুজনের একজন জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমার দিকে তাকালো।

লোকটার বয়স প্রায় আমার মতো। মাথায় কালো টুপি, পরনে কালো জামা, আর একটা সাদা টাই।

তার স্থূলকায় সঙ্গীকে দেখে মেক্সিকোর অধিবাসী বলেই মনে হলো, তার গায়ের রঙ রোদে পোড়া–তামাটে। ঠোঁটের ওপর লম্বা টানা গোঁফ।

কেন জানিনা লোক দুটোকে দেখে মনে মনে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলাম। ষষ্ঠেন্দ্রিয় যেন গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে উঠলো, সাবধান-সাবধান!

এতদিন পরে হঠাৎই আবিষ্কার করলাম পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন সত্যিই বড় নির্জন এবং এখানে আমি সম্পূর্ণ একা!

মোটা লোকটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করছিলো। কিন্তু তার সঙ্গী গাড়ি থেকে নেমে চারপাশে চোখ বোলাতে লাগলো। হয়তো দেখলো আমি ছাড়া আর কেউ এখানে আছে কিনা। পাম্পের গা থেকে তেল দেবার পাইপটা নিলাম, ক লিটার দেবো?

মোটা নোকটা নির্বিকার সুরে জবাব দিলোদশ লিটার।

ট্যাঙ্কে তেল ঢালতে ঢালতে সাদা টাই পরা লোকটার দিকে আড়চোখে তাকালাম। সে তখন গাড়ি ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে এদিক-ওদিক চাইছে, যেন কার খোঁজ করছে।

হঠাৎ আমার সন্দেহ হলো এই লোক দুটো হয়ত রেস্তোরাঁর ক্যাশ লুঠ করতে এসেছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই অন্য একটা চিন্তা আমার মনে এলো। যদি ওরা বাংলোয় গিয়ে সিন্দুকটা খুঁজে পায়।

সাদা টাইপরা লোকটা কোট থেকে একটা পিন খুলে নিয়ে দাঁত খোঁচাতে লাগলো। অনুভব করলাম ওর ক্ষুদে ক্ষুদে চোখজোড়া আমার ওপরেই নিবদ্ধ। মনে মনে ভয় পেলাম।

কি হে, তুমি এখানকার মালিক নাকি? হালকা সুরে আচমকা প্রশ্ন করলো সাদা টাই পরা লোকটি, একা থাকে না বউ ছেলেমেয়ে আছে?

আমি এখানে চাকরি করি। পাম্পের মিটারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে জবাব দিলাম, মালিক এবং তার একজন কর্মচারী একটু বাইরে গেছেন। এখনি এসে পড়বেন। ওঁদের আসার সময় অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে।

আমি তেল দেওয়া শেষ করে বালতি থেকে ভিজে স্পঞ্জটা তুলে নিলাম। এগিয়ে গিয়ে গাড়ির উইন্ডস্ক্রীন মুছতে লাগলাম।

লোকটা চুপচাপ পিন দিয়ে মাড়ি খোঁচাতে লাগলো।

আমি কাজ করতে থাকলেও আমার দৃষ্টি কিন্তু সবসময় লোক দুটোর গতিবিধির দিকে।

লোকদুটো আমার কাছে জানতে চাইলে যে খাওয়ার মতো কি কি আছে?

এতো রাতে তো স্যান্ডউইচ ছাড়া কিছুই নেই। আড়চোখে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, বারোটা বেজে কুড়ি মিনিট অর্থাৎ লোলাদের ফিরতে এখনো ঘণ্টা আড়াই বাকি। সুতরাং এ লোকদুটোর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। উপায়হীন হয়ে খাবার ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। খাবার ঘরে ঢুকে ওরা চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিল।

মোটা লোকটা আমাকে অতিক্রম করে কাউন্টার পার হয়ে রান্নাঘরের দিকে এগোলো। রান্নাঘরের দরজা খুলে ভেতরে উঁকি মারলো। কিন্তু একটু পরে ফিরে এসে সাদাটাইকে উদ্দেশ্য – করে মাথা নেড়ে জানালো, রান্নাঘরে কেউ নেই।

ঠিক সেই মুহূর্তে বুঝলাম, আমি বিপদে পড়েছি।

সাদা টাই পায়ে পায়ে টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেলো। টেলিফোন ডায়ালের ওপর আঙুলের টোকা মারলো।

লোকটা টেলিফোনের রিসিভারটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে এক হ্যাঁচকা টান মারলো। রিসিভারটা তার ছিঁড়ে দেওয়াল থেকে আলগা হয়ে বেরিয়ে এলো। সাদা টাই সরীসৃপের

মতো স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করতে লাগলো। যাও ফ্রায়েড চিকেনের ব্যবস্থা করোগিয়ে। সল, তুমি ওর সঙ্গে যাও–ওর দিকে নজর রাখো।

রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ালাম। কানে এলো অনুসরণরত সলের গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। ফ্রাইং প্যানে মুরগী চাপিয়ে সলকে প্রশ্ন করলাম, কি ব্যাপার–তোমরা এখানে কি চাও?

ভয় পেয়োনা, দোস্ত।সল এগিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর বসলো।ওর পাঁচ আঙুল রিভলবারের বাঁটের গায়ে খেলে বেড়াতে লাগলো। চুপচাপ কাজ করে যাও।

আমার বুকের কাপুনি হঠাৎ বেড়ে গেলো ঠোঁট শুকিয়ে আসতে লাগলো।

এমন সময় সাদা টাই রান্নাঘরে এসে ঢুকলো। ওর হাতে একপ্লেট স্যান্ডউইচ। সম্ভবতঃ খাবার ঘরের আলমারি থেকে তুলে নিয়েছে।

সাদা টাইয়ের মুখ স্যান্ডউইচে ঠাসা-খোকার দিকে লক্ষ্য রেখো। দেখো যেন উল্টোপাল্টা কিছু করেনা বসে। আমি একবার চারপাশটা ঘুরে দেখে আসি। কথা শেষ করে সাদা-টাই রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

সল প্লেট থেকে একজোড়া স্যান্ডউইচ তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিলো,এডি এমনিতে খুব ভালো লোক। তবে রিভলবারের ট্রিগার দেখলেই ওর ভীষণ টিপতে ইচ্ছা করে। সুতরাং ওর সঙ্গে বুঝেশুনে ব্যবহার কোরো নয়তো

মনে মনে ভাবলাম সলকে কায়দা করতে খুব একটা বেগ পেতে হবে না। ওর ওই থলথলে চেহারা নিয়ে ও আমার সঙ্গে যুঝে উঠতে পারবে বলে মনে হয় না। সুতরাং একবার যদি ওকে কাবু করে ফেলতে পারি তবে এডির সঙ্গে আমার লড়াই হবে সমানে সমানে।

ভেবে দেখলাম, যদি সাহস করে সল আর এডির মোকাবিলা করতে পারি তবে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ীরয় ও লোলা ফিরে আসার আগেই সিন্দুকের টাকাটা সরিয়ে ফেলতে পারবো। সল হঠাৎ প্রশ্ন করলো, ক্যাশে টাকা-পয়সা কি রকম আছে?

আজ বিকেলেই ব্যাঙ্কে সব টাকা জমা দেওয়া হয়ে গেছে।

দুটো খালি প্লেট নিয়ে টেবিলে রাখলাম। উত্তেজনায় শাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হয়ে উঠলো। এই মোটাটাকে ঢিট করতে হলে এটাই উপযুক্ত সময়।

–শোন ভায়া আমাদের মালের দরকার। চট্‌পট ছাড়ার ব্যবস্থা করো। এডির সঙ্গে প্যাঁচ খেলার চেষ্টা করলে তার ফল ভালো হবে না।

সল ধীরেসুস্থে টেবিল থেকে নেমে দাঁড়ালো।শিকারীর চোখেআমাকে লক্ষ্য করতে লাগলো। আমি আর দেরী না করে ফ্রাইং প্যানের গরম মুরগীগুলো সজোরে ছুঁড়ে দিলাম ওর মুখে। এক বিকট চীৎকার করে সল টলতে টলতে কয়েক পা পিছিয়ে গেলো। গরম তেল ওর চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়লো। ভাজা মুরগীর কিছু অংশ ওর টুপির ওপর, আর বাকীটা ওর কোটের গায়ে লেগে মেঝেতে ছিটকে পড়লো।

সল একহাতে মুখ চাপা দিয়ে অন্য হাতে কোমর থেকে রিভলবারটা বের করার চেষ্টা করতে লাগলো। আর দেরী না করে ফ্রাইং প্যানটা ঘুরিয়ে সপাটে বসিয়ে দিলাম ওর মুখে। সেই আঘাতে সল আরো কয়েক পা পিছিয়ে কোনোরকমে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো। ওর এক হাত তখনও খুঁজে বেড়াচ্ছে ৪৫ রিভলবারের বাট।

ফ্রাইং প্যানের আর এক আঘাতেই সল মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো। ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো একটা চাপা গোঙানি।

সলের ওপর ঝুঁকে পড়ে ওর পকেট থেকে রিভলবারটা বের করে বিনা দ্বিধায় ৪৫-এর বাঁট দিয়ে সজোরে ওর মাথায় আঘাত করলাম।

এবার ও চোখ উল্টে, হাত-পা ছড়িয়ে মেঝেতে আছড়ে পড়লো। ওর বন্দুকটা শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম।

হঠাৎ খাবার ঘরের দরজা খোলার মৃদু শব্দ হলো। আমি আর সময় নষ্ট না করে বিদ্যুৎবেগে ছুটলাম আলোর সুইচ লক্ষ্য করে। সুইচ অফ করতেই একরাশ অন্ধকারে ভরে গেলো ছোট্ট রান্নাঘরটা। বুঝলাম এডি যদিও পেশাদার খুনে তবুও আশার কথা আমি নিরস্ত্র নই।

সুতরাং রিভলবার বাগিয়ে ধরে অন্ধকার রান্নাঘরে ঘাপটি মেরে পড়ে রইলাম।

.

১৩.

সল!

অন্ধকারে ভেসে এলো এডির সতর্ক ফিসফিসে কণ্ঠস্বর, খুব সাবধানে হাল্কা পায়ে রান্নাঘরের খিড়কি দরজার কাছে গেলাম। আমার যেটুকু আশা ভরসা তা ঐ ৪৫ রিভলবারটার জন্য। যদিও জীবনে কোনদিন আমি পিস্তল ব্যবহার করিনি।

এমনু সময় খাবার ঘরের আলোটা হঠাৎ নিভে গেলো। কানে এলো কাঠের পাটাতনে পা ফেলার খসখস শব্দ।

খিড়কির দরজায় হাত রেখে ধীরে ধীরে চাপ দিলাম।

দরজা খুলতেই কানে এলো সলের চাপা গোঙানি, এবং সঙ্গে ওর নড়াচড়ার শব্দ। নাঃ সলের মাথাটা দেখছি লোহার তৈরী। ভেবেছিলাম, অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক ও অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকবে; আর সেই সময়ে এডির সঙ্গে আমার বোঝাঁপড়া শেষ হবে। কিন্তু এখন দেখছি সমূহ বিপদ।

খিড়কি দরজা পুরোটা খুলতেই অনুভব করলাম মরুভূমির উত্তপ্ত বাতাসের ঝাঁপটা। ভেবে দেখলাম বাইরে বের হতে পারলে এডির সঙ্গে মোকাবিলা করতে আমার অনেক সুবিধা হবে। সেই কারণে ৪৫ টা রান্নাঘরের দরজার দিকে কোনোরকমে তাক করে পায়ে পায়ে পেছোতে লাগলাম।

হঠাৎ চোখে পড়লো বিদ্যুৎ ঝলকের মতো নীল আগুনের রেখা–আর তার পরমুহূর্তেই রিভলবারের কান ফাটানো বীভৎস শব্দ। একটা গরম সীসের টুকরো আমার রগ ঘেঁষে বেরিয়ে গেলো। ভয়ে আমার সমস্ত শরীর ঘেমে উঠলো।

এক লাফে তিনটে সিঁড়ি পার হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম বালির ওপর। মুহূর্তের মধ্যে আত্মগোপন করলাম অন্ধকারের মধ্যে

এডির লক্ষ্য যে এতোটা নির্ভুল তা আশা করিনি।

চারিদিকের বরফ শীতল নিস্তব্ধতা পরিবেশকে আরো ভয়াবহ করে তুললো। পরিস্থিতি যেন আমাকে বারবার জানিয়ে দিচ্ছে যে আমি একা। এই বিপদের মুহূর্তে কেউ এগিয়ে আসবে না আমাকে সাহায্য করতে। সম্পূর্ণ নিজের ওপরেই আমাকে নির্ভর করতে হবে।

সামনের পাম্পগুলো চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। যে ভাবে হোক আমাকে বাংলোয় পৌঁছতে হবে।

রেস্তোরাঁর দেওয়াল ঘেঁষে পায়ে পায়ে পেছোতে লাগলাম। এমন সময় নরম স্বরে কেউ বলে উঠলো, ওহে খোকা, পিস্তল ফেলে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসো। শুধু শুধু কেন নিজের বিপদ ডেকেআনছে?

অন্ধকারের মধ্যে ঠিক বুঝতে পারলাম না কিন্তু এডির সাদা টাইয়ের ঝিলিক মুহূর্তের জন্য চোখে পড়তেই গুলি করার একটা দুর্দম ইচ্ছা আমাকে পেয়ে বসলো। কিন্তু পরক্ষণেই সে নির্বুদ্ধিতার পরিণতির কথা চিন্তা করে নিরস্ত হলাম।

ভীষণ ভয় পেলেও স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি আমি তখনও হারাইনি। তাই যখন আরো একবার কানে এলো এডির নেশা ধরানো হাল্কা স্বর, আমি যেমন বসে ছিলাম, তেমনি রইলাম। কিন্তু আমার মনে হলো এডির কণ্ঠস্বর যেন আরো অনেকটা কাছে এগিয়ে এসেছে। রুদ্ধশ্বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। এডি যদি কোনো রকমে একবার বুঝতে পারে আমি কোথায় লুকিয়ে আছি, তাহলে আমাকে খুন করতে ও এতোটুকু দ্বিধা করবে না।

খুব সাবধানে বালিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। বুকে হেঁটে এগোতে যেতেই পায়ে ঠেকলো একটা পাথরের টুকরো। অতি সাবধানে ওটা তুলে নিয়ে বিপরীত দিক লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিলাম। পাথরটা রেস্তোরাঁর দেওয়ালে গিয়ে সশব্দে আঘাত করলো। সঙ্গে সঙ্গে চোখ ধাঁধানো নীল আলো, আর পিস্তলের বিকট গর্জন

পিস্তলের আলোটা ঝলসে উঠছে ঠিক খিড়কি দরজার কাছ থেকে। কিন্তু আমি রিভলবার তুলতে গিয়েই থমকে গেলাম। কারণ এডি আমাকে গুলি করার পরমুহূর্তেই সিঁড়ির পেছনে বালির ওপর লাফ দিলো। বুঝতে পারলাম এডি সিঁড়ির ধাপের আড়ালে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। এই সংকটময় মুহূর্তে হঠাৎই এডিকে দেখতে পেলাম।

সন্তর্পণে একটু একটু করে রিভলবার শক্ত করে ধরে এডির ঝাপসা সাদা টাইয়ের ওপর তাক করলাম। অস্থির-ভয়ার্ত আঙুল ট্রিগারের ওপর ক্রমশঃ চেপে বসতে লাগলো

কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে রিভলবার নামিয়ে নিলাম। আর সেটাই হলো আমার চরম নির্বুদ্ধিতা। কারণ রিভলবার নামানোর এই সামান্য নড়াচড়া এডির শিকারী দৃষ্টিবে ফাঁকি দিতে পারলো না।

আগুনের ঝলক আর রিভলবারের গুলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বুকে অনুভব করলাম এক প্রচণ্ড ধাক্কা। সারা শরীর কেঁপে উঠলো। কিন্তু কোনো যন্ত্রণাই অনুভব করলাম না। শুধু মনে হলো, আমার মস্তিষ্কের ভেতর কেউ যেন একটা সুইচ অফ করে দিয়েছে, আর তারই ফলস্বরূপ নির্বাপিত হয়েছে আমার শক্তির উৎস, শরীরের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হয়েছে অকেজো।

বালির ওপর মুখ থুবড়ে পড়তেই অনুভব করলাম উষ্ণ উত্তাপ। রিভলবারটা হাত থেকে খসে বালির ওপর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা ছুঁচলো জুতোর অগ্রভাগ সপাটে এসে আছড়ে পড়লো আমার পাঁজরে।

মনে হলো একটা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের কাছে আমি দাঁড়িয়ে আছি। তার উত্তাপে আমার ভেতরটা পর্যন্ত পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। রক্ত সমুদ্রের বিশাল ঢেউ যেন আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি। শরীরের অসহ্য যন্ত্রণা ক্রমশঃ ফিকে হয়ে আসতে লাগলো

পরে রয়ের কাছে ঘটনা শুনেছিলাম ওয়েন্টওয়ার্থ থেকে ফিরে এসে ওরা লক্ষ্য করে পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন সম্পূর্ণ অন্ধকারে ঢাকা। তাই দেখে রয়ের মনে কেমন যেন সন্দেহ হয়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বালির ওপর আমাকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে

দেখে। লোলা এবং রয় দুজনে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে আসে তারপরই আমার জ্ঞান ফিরে আসে।

জ্ঞান ফিরলে দেখি রয় আমার দেহের ওপর ঝুঁকে রয়েছে। ওর মুখ সাদা, হাত পা থর থর করে কাঁপছে। রয়ের ঠিক পেছনেই স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে লোলা। উত্তেজনায় ওর মুখের রেখা কঠিন–চোখের তারায় কৌতূহল।

আমাকে চোখ মেলতে দেখেই লোলা রয়কে পাশ কাটিয়ে ঝুঁকে পড়লো আমার মুখের ওপরকাঁপা স্বরে প্রশ্ন করলে কি হয়েছিলো, শেট? কে তোমার এ অবস্থা করেছে?

আমার কথা বলার কোনো শক্তি নেই। আমি ভেসে চললাম অন্ধকারের রাজ্যে। একরাশ কালো অন্ধকার যেন উন্মত্ত আক্রোশে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার ওপর। মনে হলো, এই বোধহয় শেষ অন্ধকার জীবনের ওপিঠ, মৃত্যু। কিন্তু আশ্চর্য, এই মৃত্যুভয় আমার মনে আশঙ্কার পরিবর্তে এনে দিলো এক বিচিত্র প্রশান্তি। চেতনার সীমারেখা পার হতেই যন্ত্রণার রেশ ক্রমশঃ ফিকে হয়ে মিলিয়ে গেলো। জমাট অন্ধকারের বিশাল টুকরো এসে আশ্রয় নিলো দু চোখের পাতায়

কিছুক্ষণ পর চোখ মেলেই দেখি রয় আমার পাশেই বসে আছে। চোখের চিন্তাকুল দৃষ্টি আমার মুখের ওপর নিবদ্ধ। কিন্তু লোলাকে কোথাও দেখলাম না। সম্ভবতঃ ও বাংলোয় ফিরে গেছে। রয় আমাকে প্রশ্ন করলো, এখন কেমন আছিস?

ভালোই।

মনে হলো, এই একটা শব্দ উচ্চারণ করতেই শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয়েছে। শরীর দুর্বল হলেও আমার চিন্তাশক্তি কিন্তু আচ্ছন্ন হয়নি। এমন সময় জানলা দিয়ে ভেসে এলো হর্নের তীক্ষ্ণ শব্দ। রয় উঠে দাঁড়ালো। চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইলাম। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। হঠাৎ এক মৃদুশব্দে চমকে চোখ মেলোম। সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। দেখি, লোলা আমার মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছে।

শেট, কারা তোমাকে গুলি করেছে?

দুজন লোক; ওদের কাছে রিভলবার ছিল, অস্পষ্ট স্বরে জবাব দিলাম। অতিকষ্টে চোখ ফিরিয়ে লোলার দিকে তাকালাম। ওকে আর আগের লোলা বলে চেনা যায় না। চোখের কোণে কালি পড়েছে। এই ক দিনে লোলার বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে। ওর মুখ যেন কাগজের মতো সাদা।

ওরা কি সিন্দুকের কথা জিজ্ঞেস করেছিলো?

বললাম–না।

লোলার ফ্যাকাশে মুখে লোভ উল্কণ্ঠার ছায়া।–কি করে সিন্দুক খুলতে হয় আমাকে বলে দাও শেট, চুপ করে থেকো না।

আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়ালো সেই অন্ধকার; আমাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরলোসবকিছুর সামনে কে যেন হঠাৎ টেনে দিলো এক কালো পর্দা

জীবন মৃত্যুর অনিশ্চয়তার দোলায় কেটে গেলো তিনটে দিন, সব কিছু ভবিতব্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছি।

রয় যদি জীবনপণ করে এভাবে আমার সেবা না করতো, তাহলে হয়তো এই তিনটে সূর্যোদয় দেখার সৌভাগ্যও আমার হতো না। এক সেকেন্ডের জন্যেও চোখের পাতা এক করেনি রয়।

রয়ের কাছে শুনেছি মাঝে মাঝে নাকি আমার অবস্থা চরমে উঠেছিল।

প্রায় সাতদিন পর ফিরে পেলাম কথা বলার শক্তি। তখন রয়ের সঙ্গে এডি এবং সলের ব্যাপারটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলাম। শুনলাম এডি নাকি ক্যাশবাক্স আর পেট্রল বিক্রির টাকা-সব কিছুই নিয়ে গেছে।

রয় আমাকে বললো তোর কোন ভয় নেই শেট, তুই এবারে ধীরে ধীরে ভালো হয়ে উঠবি।

আটদিন আটরাত আমি অসহায়ভাবে বিছানায় পড়েছিলাম। কিন্তু লোলা একবারের জন্যও আমার কাছে আসেনি। জানি না, এই কদিনে রয়ের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে।

একদিন রয় আমার কাছে জানতে চাইলো, শেট, সত্যি করে বলতো জেনসনের আসলে কি হয়েছে?

আমিও মনে মনে ভাবছিলাম যে করেই হোক রয়কে সমস্ত ঘটনা জানানো ভীষণ প্রয়োজনীয়। তাই ওকে সত্যি কথাই বললাম, লোলা কার্লকে খুন করেছে–আর আমি বোকার মতো লোলার কথায় রাজী হয়ে সেই মৃতদেহটা কবর দিয়েছি।

ওকে আরও বললাম, লোলার প্রথম স্বামীর কথা এবং সেই স্বামীকেও লোলা নৃশংশভাবে খুন করেছে। তুই সাবধানে থাকিস, রয়, লোলার রক্তে মিশে আছে খুন করার নেশা। প্রয়োজন হলে তোকেও খুন করতে ওর একটুও হাত কাঁপবে না।

সব শুনে রয়ের চোখে ফিরে এলো নির্বিকার শূন্যদৃষ্টি। রয় কোনো কথা না বলে দরজার দিকে পা বাড়ালো। মনে মনে ভাবলাম, যাক্রয়কে যে আগে থাকতে সাবধান করে দিতে পেরেছি তাতেই আমার সান্ত্বনা।কিন্তু তখনও বুঝিনি, আমার অনেক দেরি হয়ে গেছে; সাবধান করার আর প্রয়োজন নেই। কারণ পরদিন রাতেই আমি আমার ভুল বুঝতে পারলাম।

সেদিন রাত প্রায় এগারোটা বাজতেই দেখি, লোলা বাংলোয় ফিরে চলেছে। তার একটু পরেই নিভে গেলো বাংলোর আলো। রাত প্রায় বারোটা নাগাদ রয় রেস্তোরাঁর আলো নিভিয়ে ঘরে আমাকে উঁকি মেরে দেখলো। তারপর শুনতে পেলাম দরজা বন্ধ করার মৃদু শব্দ।বুঝতে পারলাম, রয় ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

সব কিছু জেনেশুনেও মনে প্রাণে চাইলাম আমার অনুমান যেন মিথ্যে হয়। রয় সম্বন্ধে আমার ধারণা যেন এই অসুস্থ চিন্তায় কলঙ্কিত না হয়। কিন্তু আমি জানি এ মিথ্যা স্তোক দিয়ে লাভ নেই। কারণ, বাস্তবকে অস্বীকার করার ক্ষমতা আমার কেন এ পৃথিবীতে

কারোর নেই। জানলা দিয়ে উঠোনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। একটু পরেই রয় অন্ধকারে এগিয়ে চলল।

অন্ধকারে শুয়ে নিজেকে বড়ো অসহায় মনে হতে লাগলো, ঈর্ষার বদলে অনুভব করলাম আতঙ্কের অস্তিত্ব। লোলা একবার যখন রয়কে কজা করেছে তখন ওকে দিয়ে সিন্দুক ভোলাবেই। তারপর ও রয়কে খুন করবে।-না, এ বিষয়ে এতোটুকু সন্দেহ আমার নেই।রয়ের ঘরে আমাকেও লোলার শিকার হতে হবে। তারপর টাকাগুলো জায়গা মতো লুকিয়ে ফেলে খবর দেবে সেই শেরিফকে। লোলার স্বরূপ আমি জানি; ওর আসাধ্য কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না।

রাত প্রায় দুটো নাগাদ রয় বাংলোর দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। দরজা বন্ধ করে ঘরের দিকে আসতে লাগলো, নিঃশব্দে বসবার ঘরে এসে ঢুকলো রয়। একই সঙ্গে আমিও হাত বাড়ালাম আলোর সুইচের দিকে।

আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে ও স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইলো।

আমি রয়কে ডাকলাম, আয় এখানে এসে আমার পাশে বস, তোর সঙ্গে জরুরী কথা আছে। রয় ধীরে ধীরে এসে আমার পাশে বসলো। লোলা তোকে শেষ পর্যন্ত তাহলে ফাঁদে ফেলেছে?ই, রয় কোনো জবাব দিলোনা। আমি ওকে জানিয়ে দিলাম যে,আমার কথায় যদি তুই সাবধান না হোস তবে তোর কবর তুই নিজেই খুঁড়বি মনে রাখিস। আমি ওকে জেনসনের সিন্দুকের কথা সব কিছুই বলে দিলাম। বললাম, জেনসনের সিন্দুকে এমন একটা জিনিস আছে যেটানাহলে লোলার চলবেনা।আর সেটা পাওয়ার

জন্য হেন কাজ নেই যে লোলা করতে রাজীনয়। এমন কি খুন করতেও ওর বিবেকে বাধবে না। এ জিনিসটার জন্যই ও জেনসনকে খুন করেছে। ভয় দেখিয়ে আমাকে দিয়েও সিন্দুক খোলাতে চেয়েছে, কিন্তু পারেনি।আর এখন যেই তোকে হাতের কাছে পেয়েছে, অমনিওরকাজ শুরু হয়ে গেছে। লোলা জানে তুই সিন্দুক খুলতে জানিস; তাই তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করছে। তোকে দিয়ে যে করে থোক সিন্দুক খুলিয়ে ও তোকে খুন করবে।

কথা বলার পরিশ্রমে আমার সারা শরীর ঘেমে উঠলো। বুকের যন্ত্রণায় মনে হলো নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসবে।কিন্তু ওরঅভিব্যক্তিহীনমুখেনিস্পৃহতার মুখোস।শুধু চোখের তারায় ঈষৎকালো ছায়া।অধৈর্য হয়ে ওপ্রশ্নকরলে তোর কিমাথাখারাপহয়ে গেছে?সিন্দুকেকিএমনআছে যে লোলার সেটা না হলে চলবেনা?সিন্দুকে যে এক লাখ ডলার আছে; সে কথা বলার মতো বুদ্ধিভ্রংশ তখনও আমার হয়নি। তাই একটা বিশ্বাসযোগ্য কাল্পনিকগল্প ওকে শুনিয়ে দিলাম।রয় ঘাড়ে হাত বুলিয়ে ভুরু কুঁচকে তাকালো; শেট, তুই, কি এগুলো সব বানিয়ে বলছিস, না সত্যি?

এর এক বর্ণও মিথ্যা নয়, রয়। সেদিন জেনসনকে গুলি করার পর লোলা আমাকেও খুন করতো। কিন্তু ও দ্বিতীয়বার ট্রিগার টেপার আগেই আমি সিন্দুকের দরজাটা বন্ধ করে দিই। ও জানতে আমার সাহায্য ছাড়া ওর পক্ষে সিন্দুক খোলা অসম্ভব; তাই এতোদিন আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ও জানে, এখন আর আমার প্রয়োজন নেই, সিন্দুকটা তুই কিছুতেই খুলিস না, রয়–আমার কথা শোন! জেনসন মারা যাবার পর পাঁচটা সপ্তাহ আমরা চুপচাপ, একা একা কাটিয়েছি, তারপর একদিন রাতে লোলা আমার ঘরে এসে

উপস্থিত হলো– তারপর যা হবার তাই হলো;ঠিক তের বেলা যেমনটা হয়েছে। কিন্তু বিশ্বাস কর, তার আগে সেরকম কোনো চেষ্টাই আমি করিনি।

হাঁফাতে হাঁফাতে কোনো রকমে কথা শেষ করলাম। অনুভব করলাম মেরুদণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে গায়ের ঘামের শীতল স্রোত।

রয় আমার অবস্থা বুঝে আমার কাছে এগিয়ে এলো, কি হলো তোর?–নে, চুপচাপ শুয়ে পড়। একে তোর শরীর ভালো নয়, তার ওপর শুধু শুধু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিস।

আমি রয়ের হাত চেপে ধরলাম, যদি তুই সিন্দুকটা খুলিস, তাহলে আমরা কেউই লোলার হাত থেকে রেহাই পাবো না। আমি তোকে বারবার করে বলে রাখছি রয়-সিন্দুক খোলা মানে নিজেদের মৃত্যুকে ডেকে আনা!

আচ্ছা বাবা ঠিক আছে। কিন্তু তুই মিছিমিছি ভয় পাচ্ছিস, শেট। লোলা সিন্দুক খোলার ব্যাপারে আমাকে কিছুই বলেনি।

আমি ক্লান্ত দেহে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। অবসাদে আমার চোখ বন্ধ হয়ে এলো।

আমার কর্তব্য আমি পালন করেছি। রয়কে খোলাখুলি সব বলে দিয়ে সাবধান করে দিয়েছি। এখন বাকীটা ভাগ্যে যা আছে ঘটবে। তবে মনে হয় এবারের যুদ্ধে লোলা পরাজিত হবে। কিন্তু সে আশা কুহকিনী!

সে রাতে ঘুম না আসা পর্যন্ত রয় আমার পাশেই বসে রইলো। পরদিন সকাল দশটায় ঘুম ভাঙলো। নিজেকে বেশ সতেজ বলে মনে হলো। মাথাটা যেন আগের থেকে হালকা ঠেকলো। কিন্তু বুঝতে পারলাম উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা এখনো আমার হয়নি।

জানলার ধারে শুয়ে শুয়ে দেখতে লাগলাম বাইরের কর্মচাঞ্চল্য। লোলা আর রয় অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে চলেছে। রেস্তোরাঁ খদ্দেরদের ভিড়ে জমজমাট।

প্রায় রাত দশটার সময় রয় এলো আমার ঘরে, হাতে স্যুপ এর বাটি।

হঠাৎ রয়ের চোখে কেমন অস্বস্তির ভাব লক্ষ্য করলাম। ও আমাকে বললো, একটু আগে খাবার সময় লোলা সিন্দুকের কথা বলেছে। জিজ্ঞেস করেছে, একটা লরেন্স সিন্দুক আমি খুলতে পারবো কি না!

আমি ওর কথা শুনে চমকে উঠলাম। লোলা তাহলে তোকে সিন্দুকের কথা বলেছে?

হা। তারপর আমি বললাম যে সিন্দুকটা না দেখা পর্যন্ত আমার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়।

আমার বুকের ভেতর তখন শুরু হয়ে গেছে তুমুল আলোড়ন।

তোকে আবার বলছি রয়, সিন্দুকটা যতোক্ষণ বন্ধ আছে, ততোক্ষণ আমরা নিরাপদ। কিন্তু

জানি তুই কি বলবি। আমাকে হাত তুলে বাধা দিয়ে রয় বললো, এতই যদি তোর ভয় তাহলে জেনসনের সেই রিভলবারটা আমাকে দে না কেন?

আমি বললাম যে রিভলবারটা আমার কাছে আর নেই। ওটা লোলা হাতিয়েছে।

রয় ভীষণভাবে চমকে উঠলো। কি একটা বলতে গিয়েও থেমে গেলো। লোলা আমাকে বলেছে রিভলবারটা ওয়েন্টওয়ার্থের রাস্তায় পুঁতে ফেলেছে; কিন্তু আমার ধারণা অন্যরকম।

রয় চিন্তিত মুখে বসে রইলো। এরপর এ ব্যাপারে আমাদের আর কথা হলো না।

পরবর্তী চারটে দিন সাধারণ ভাবে কেটে গেলো। রয় আমাকে বলেছে, লোলা এখনও ওকে সিন্দুক খোলার কথা বলেনি। জানি না, সত্যি কি মিথ্যা।

আমি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেও বিছানা ছেড়ে নামার শক্তি এখনও আমার হয়নি। তবে সান্তনার কথা, রয় আজকাল আর বাংলোতে শুতে যায় না। আমার মনে হয় রয়ের এই হঠাৎ উদাসীনতার কারণ সম্ভবতঃ লোলার প্রতি ওর প্রচ্ছন্ন আতঙ্ক। অর্থাৎ আমার কথা.ওর মনে রেখাপাত করেছে। লোলা যে দু-দুটো খুন করেছে সে বিষয়ে রয়ের মনে আর কোনো সংশয় নেই।

বেশ কয়েকদিন পরে রাত তিনটের সময় আচমকা ঘুম ভেঙে যেতেই দেখি,বাংলোয় বসবার ঘরে আলো জ্বলছে। বুকের ভেতরটা ধক করে উঠলো। বার কয়েক ঢোক গিলে

রয়ের নাম ধরে আস্তে আস্তে ডাকলাম। কিন্তু কোনো উত্তর পেলাম না। অর্থাৎ রয় এখন বাংলোর বসবার ঘরে; এখানে ওর সঙ্গে রয়েছে লোলা, আর সেই অভিশপ্ত সিন্দুক।

মনে হলো এখনই বিছানা ছেড়ে ছুটে যাই বাংলোয়; কিন্তু জানি, আমার এই অসুস্থ দেহ নিয়ে তা কখনই সম্ভব নয়। সুতরাং চুপচাপ বসবার ঘরের আলোকিত জানলার দিকে চেয়ে গুনতে গেলাম হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন।

রাত প্রায় চারটের সময় বাংলোর আলো নিভে গেলো। একটু পরেই রয় বাংলো থেকে বেরিয়ে আমার ঘরের দিকে হেঁটে আসতে লাগলো।

একটু পরে আমার ঘরের দরজা খুলে গেলো। রয়ের গলা ভেসে এলো। –আলো জ্বালাস না। লোলা দেখতে পাবে।

এতোক্ষণ কি করছিলি বাংলোয়?

লোলা আমাকে সিন্দুকটা দেখিয়ে খুলতে বলেছিলো। আমি বললাম এটা খুব পুরোনো আমলের, আমার পক্ষে খোলা সম্ভব নয়।

আমার বুক ভেদ করে বেরিয়ে এলো স্বস্তির নিঃশ্বাস।

সিন্দুকে কি আছে, কেন ও সিন্দুক খুলতে চায় সে বিষয়ে তাকে কিছু বলেছে? আমার উদগ্র কৌতুহল আর বাধ মানতে চাইছে না। অশান্ত তরঙ্গের মতোই মনের ভেতরে আছড়ে পড়ছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রয় বললো, সিন্দুকে নাকি প্রচুর টাকা আছে। সিন্দুক খুললে লোলা আমাকেও সে টাকার ভাগ দেবে। রয় আমার কাছে জানতে চাইলো সিন্দুকে সত্যিই টাকা আছে কি না।

এক্ষেত্রে ওকে সত্যি কথা বলা মানে সর্বনাশ ডেকে আনা। সুতরাং বাধ্য হয়েই বললাম, আছে তবে মাত্র তিনশো ডলার। জেনসন দুঃসময়ের সঞ্চয় হিসাবে ঐ টাকা সিন্দুকে জমিয়ে রেখেছিলো। কিন্তু লোলার লোভ ঐ তিনশো ডলারের জন্য নয়, ও চায় সেই স্বীকারোক্তি লেখা কাগজটা।

কিন্তু ও যে বললো, সিন্দুকে প্রায় এক লাখ ডলার আছে?

রয়ের মুখে বিস্ময়ের ছায়া।

লোলা তোকে মিথ্যে কথা বলেছে, তোকে দিয়ে সিন্দুকটা খোলানোর জন্য ও এই টাকার টোপ ফেলেছে।

রয় চিন্তান্বিত ভাবে জবাব দিলো, তাই যদি হয় তাহলে লোলাকে হতাশ হতে হবে। শেষের দিকে ওর গলার স্বর কঠিন মনে হলো।

পরদিন সকালে শুয়ে শুয়ে জানলা দিয়ে বাইরে চেয়েছিলাম। দেখছিলাম পাম্পের কাছে কর্মব্যস্ত রয়কে। এমন সময় দরজা খোলার শব্দ পেয়ে চমকে মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই দেখি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে লোলা। লোলাকে দেখে যেন চেনাই যায়না। মুখের

রেখা কঠিন। গাল ভেঙে চোয়ালের হাড় হয়ে উঠেছে প্রকট। চোখের কোলে কালি পড়েছে।

লোলা ওর অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। আর সবকিছু অচেনা লাগলেও লোলার এই সাপিনী সবুজ চোখ আমার অনেকদিনের চেনা।

কর্কশ কাঁপা গলায় লোলা বলে উঠলো, কি করে, সিন্দুক খুলতে হয় আমাকে বলে দাও।

যদি না বলো তবে এখনি আমি পুলিশে খবর দেবো। আর তোমাকে আবার ফিরে যেতে হবে সেই ফার্নওয়ার্থে।

আমি ভয় না পেয়ে বললাম, তবে আর দেরী করছো কেন? যাও পুলিশে খবর দাও। কিন্তু ঐ একলাখ ডলার এর আশা আর করোনা! তাছাড়া পুলিশকে আমিও বলে দেবো, জেনসনের মৃতদেহ কোথায় লুকোনো আছে। ভেবো না, পুলিশ আমার কথা অবিশ্বাস করবে আর তোমার কথায় সায় দেবে। কারণ তুমিও তো আর ধোয়া তুলসী পাতাটি নও। ওদের যদি জানিয়ে দিই ফ্র্যাঙ্ক ফিনির কথা তাহলে তোমাকে আর রক্ষা পেতে হবে না।

আমার কথাগুলো শুনে লোলা ভীষণভাবে চমকে উঠলো। ওর শরীরটা পলকে যেন পাথর হয়ে গেলো। অন্ধ আতঙ্কের নিবিড় ছায়া কেঁপে উঠলো ওর সবুজ চোখে।

ফ্র্যাঙ্ক সম্বন্ধে তুমি কি জানো? আগুনঝরা চোখে জানতে চাইলো লোলা।

আর কিছু না জানলেও তুমি যে ওকে খুন করেছে তা জানি। মিথ্যা রাগ দেখিয়ে লাভ হবে না লোলা। আমরা দুজনেই এমন ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছি। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, বাকী দিন কটা আমাদের এইভাবেই একসঙ্গে কাটাতে হবে। এছাড়া আমাদের আর কোনো পথ নেই। সেই সঙ্গে আর একটা কথা মনে রেখো, জেনসনের সিন্দুকটা যেমন আছে তেমনিই থাকবে। রয়কে আমি তোমার সম্বন্ধে সব কথা বলেছি, সাবধান করে দিয়েছি। তাছাড়া সিন্দুক কি করে খুলতে হয়, তাও ও জানে না। সুতরাং শুধু শুধুই তুমি রয়ের পেছনে সময় আর বুদ্ধি খরচা করছে।

অনেকক্ষণ ধরে আমার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো লোলা। তারপর এক সময় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

এই পরাজয়কে সাময়িক ভাবে মেনে নিলেও লোলা আমাকে সহজে ছাড়বে বলে মনে হয় না। আহত নাগিনীর মতোই ও হয়ে উঠেছে প্রতিহিংসাপরায়ণ। সতর্ক না থাকলে যে কোনো মুহূর্তেই লোলা চরম আঘাত হানতে পারে।

মানসিক অস্বস্তি ও উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে এর পরের দুটো দিন নির্বিঘ্নেই কেটে গেল। কিন্তু তৃতীয় দিনের দিন রয় হঠাৎ আমাকে এসে বললো, লোলা ওয়েন্টওয়ার্থে সিনেমা দেখতে যাচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে দপ করে জ্বলে উঠলো বিপদের সঙ্কেত। আমি রয়ের দিকে সন্দেহভরা চোখে তাকালাম। তার মানে ও তোকে এখানে একা রেখে যাচ্ছে?

রয় বললো, ও আমাকে সিনেমায় যাবার জন্য বলেছিলো কিন্তু আমি রাজী হইনি। কেননা তোকে এই অবস্থায় ফেলে যেতে আমার মন চাইলো না।

নিজেকে ছলনা করার চেষ্টা করিস না, রয়। তুই ভালো ভাবেই জানিস, লোলা সিনেমায় যাচ্ছে না। তোর সামনে টোপ ফেলে তোকে সেটা গিলবার একটা সুযোগ দিচ্ছে। লোলা এতোদিনে বুঝে গেছে, এই দুনিয়াতে তোর কাছে টাকাই সব। সুতরাং তোর এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ও তোকে ফাঁদে ফেলতে চাইছে। লোলা জানে, ও সিনেমায় যাওয়া মাত্রই তুই সিন্দুক খুলতে চেষ্টা করবি। তাই ও সিনেমায় যাওয়ার ছল করে কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে থাকবে। তারপর হঠাৎ ফিরে এসে খোলা সিন্দুক সমেত তোকে হাতেনাতে ধরে ফেলবে। বুঝতেই পারছিস, তোকে বোকা বানিয়ে কার্যোদ্ধার করার এই একটা মাত্র পথ খোলা আছে।

তোকে তো বলেছি শেট, সিন্দুক আমি খুলছি না।

ভালো কথা, তবে লোলা সিনেমায় যাওয়ার পর যেন কথাটা তোর মনে থাকে।

রাত দশটার পরে লোলা মার্কারির দিকে এগিয়ে গেলো। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি ছেড়ে দিল। আর রয় রেস্তোরাঁর কাছ থেকে ওকে লক্ষ্য করল চাঁদেরআলোয় দেখা গেলো উত্তেজনায় ওর মুখ কঠিন। স্থির দুই চোখে তাকিয়ে আছে মার্কারির মিলিয়ে যাওয়া লাল আলোর দিকে।

রয় রেস্তোরাঁয় ঢুকতেই বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইলাম বাইরের আকাশের দিকে। আসন্ন কোনো দুর্ঘটনার প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করে রইলাম।

ধীরে ধীরে উপলব্ধি করলাম, জীবন পথের শেষ মাইলস্টোনের পাশে পরিশ্রান্ত দেহে অবসন্ন মনে আমি দাঁড়িয়ে আছি। ওপারের চির শান্তির জগৎ আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

সময় যেন আর কাটতেই চায় না। ঘড়ির কাটা শম্বুক গতিতে এগিয়ে চলেছে। ঘণ্টাখানেক পর লক্ষ্য করলাম, হেডলাইট জ্বালিয়ে একটা ট্রাক এদিকে এগিয়ে আসছে। ট্রাকটা ধীরে ধীরে পাম্পের কাছে এসে থামলো।

রয় গাড়ির শব্দ পেয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এলো। ট্রাকের ট্যাঙ্কে তেল ঢালতে ঢালতে ড্রাইভারের সঙ্গে দু-একটা কথাও বললো। তারপর তেলের দাম মিটিয়ে লোকটা ট্রাক ছেড়ে দিলো।

বুঝতে পারলাম, এই সেই সংকটময় মুহূর্ত। রয়ের দ্বিধাগ্রস্ত মন এই মুহূর্তেই চরম সিদ্ধান্ত নেবে। হঠাৎ গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলো।

রয় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বাংলোর দিকে এগিয়ে চলল।

ওর অসীম অর্থলিপ্সা লোলার প্রলোভনকে এড়াতে পারলো না। বুঝতে পারলাম যে রয় টোপ গিলেছে। ও এখন অভিশপ্ত সিন্দুক খুলতে যাচ্ছে।

বাংলোর দরজার কাছে পৌঁছে রয় একটু থামলো। তারপর পেছনে এক পলক নজর বুলিয়েই বাংলোয় ঢুকে পড়লো। একটু পরে আবার বাইরে বেরিয়ে এলো। বাংলোর দরজায় দাঁড়িয়ে ওয়েন্টওয়ার্থের আঁকাবাঁকা রাস্তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো।

তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে আবার বালোয় গিয়ে ঢুকলো। রয়ের এই অতিরিক্ত সাবধানতায় আমার হাসি পেলো। লোলাকে ও এখনও ঠিকমতো চিনতে পারেনি।রয়ের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই লোলা ফিরে আসবে। এব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

একটু পরেই বাংলোর বসবার ঘরে আলো জ্বলে উঠলো। সিন্দুক খুলতে রয়ের হয়তো মিনিট চারেক লাগবে। তারপরই বুঝতে পারবে যে লোলার কথাই সত্যি। দেখবে সিন্দুকে সাজানো রয়েছে একলাখ ডলার। না, এখন আর ওকে বাধা দেওয়া সম্ভব নয়। আমার যথাসাধ্য আমি করেছি। কিন্তু এই তাসের জুয়ায় শেষ পর্যন্ত আমি লোলার কাছে হেরে গেছি।

আমার অনুমানই ঠিক। একটু পরেই দেখলাম যে চুপিচুপি লোলা বাংলোর দিকে এগিয়ে আসছে।

রয় রেস্তোরাঁয় ঢুকবার পরই ও হয়তো গাড়ি থামিয়েছে পাহাড়ী রাস্তায়। তারপর হেডলাইট নিভিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে অতি সন্তর্পণে ফিরে এসেছে পয়েন্ট অফ নো রিটার্নএ।

লোলার দক্ষতার প্রশংসা করতেই হবে। কারণ আমি সারাক্ষণই চেয়েছিলাম বাইরের রাস্তায়। কিন্তু ওকে ফিরে আসতে বা গাড়ি থামাতে আমিও দেখিনি।

কিন্তু ঐ তো লোলা বেড়ালের মতো নিঃশব্দ চরণে এগিয়ে চলেছে বাংলোর দিকে।

চাঁদের আলোতে আলোকিত বালির উঠোনটুকু পার হওয়ার সময় দেখলাম ওর সবুজ পোশাক। জেনসনকে খুন করার সময় ওর পরনে এই একই পোশাক ছিলো। হয়তো এই সবুজের আড়ালেই লুকিয়ে আছে রয়ের মৃত্যুসংকেত।

শেষ পর্যন্ত তাহলে লোলার ফাঁদে ধরা পড়লো রয়। আমি যেন দেখতে পেলাম খোলা সিন্দুকটার সামনে হাঁটু মুড়ে বসে আছে রয়। ও হতভম্ব হয়ে চেয়ে আছে থরে থরে সাজানো এক লাখ ডলারের দিকে। ঐ অবস্থায় বসবার ঘরে দরজা খোলার শব্দ ওর কানে ঢুকবেনা। এবং লোলা ওকে খুন করবে। এ ব্যাপারে আমার আর কোনো সন্দেহ নেই।

রয় এখনও জানে না মৃত্যু গুঁড়ি মেরে ওর দিকে এগিয়ে চলেছে।

আর সহ্য করতে না পেরে গায়ের চাদর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে বসলাম। টলতে টলতে এগিয়ে গেলাম দরজার দিকে, মাথাটা অসম্ভব ভারী ঠেকলো। দরজার হাতলে ভর দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালাম। বুকের মধ্যে যেন আগুন জ্বলছে। মনের মধ্যে তখন একই চিন্তা, যে ভাবে হোক বাংলোয় গিয়ে রয়কে বাঁচাতে হবে।

কোনো রকমে দরজা খুলে বসবার ঘরে এলাম। বুকের কাছটা কেমন যেন উষ্ণ ভিজে ভিজে ঠেকলো। বুঝতে পারলাম পুরোনো ক্ষত থেকে আবার রক্তস্রাব শুরু হয়েছে। কিন্তু সে সব গ্রাহ্য না করে অন্ধকারে পা বাড়ালাম। কিন্তু লোলাকে বাইরে কোথাও দেখলাম না। তাহলে কি?– টলতে টলতে বাংলোর দিকে এগিয়ে চললাম। আমার বুক, পেট তখন

রক্তে ভেসে যাচ্ছে। সর্পিল রেখায় তখন গা বেয়ে এগিয়ে চলেছে রক্তের উষ্ণ ধারা। কিন্তু আমি না থেমে এগিয়ে চললাম।

বাংলোর কাছে পৌঁছতেই কানে এলো রিভলবারের চাপা গম্ভীর শব্দ। হৃৎপিণ্ড ডিগবাজি খেয়ে আছড়ে পড়লো বুকের ভেতর। থর থর করে কাঁপতে লাগলাম। সেই সঙ্গে কানে এলো গুরুভার কিছু পতনের শব্দ। আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে এক ধাক্কায় খুলে ফেললাম বাংলোর ভেজানো দরজা। টলতে টলতে বসার ঘরে ঢুকলাম

দেখলাম রয় দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। ওর হাতের মুঠোয় জেনসনের ৪৫ রিভলবারটা। সিন্দুকের দরজা হাট করে খোলা। পরিষ্কার নজরে পড়ছে থরে থরে সাজানো নোটের বান্ডিলগুলো। রয়ের পায়ের কাছে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে লোলা।ওর কপালে গভীর ক্ষত। লোলা যে বেঁচে নেই, এ কথাটা বুঝতে আমার দেরী হলো না।

আমি আর রয় পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলাম। ওর মুখ রক্তহীন, পাণ্ডুর।নাকের ওপরে জমে ওঠা ঘামের ফোঁটা ঘরের উজ্জ্বল আলোয় চক্করছে। আমি কোনোরকমে একটা চেয়ারে গিয়ে গা এলিয়ে দিলাম। বুকের ব্যাভেজের কাছটায় কেমন যেন একটা কালচে ভাব।

রয় হতবাক হয়ে লোলার মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে রইল।

রয় আমাদের পালাতে হবে। বুকের রক্তে ভেজা ব্যান্ডেজ দু হাতে চেপে ধরলাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গাড়িটাকে বাংলোর কাছে নিয়ে আয়! পুলিশ এসে গেলে আমরা বিপদের মধ্যে পড়ে যাবো। নে টাকাগুলো চটপটু গুছিয়ে নে! এখনও পালাবার সময় আছে

রয় আচ্ছন্ন স্বরে বললো, লোলা ঘরে ঢুকতেই আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর কাছ থেকে রিভলবারটা কেড়ে নিয়েছি। কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি ওকে খুন করতে চাইনি।

আর দেরী না করে রয় সিন্দুকের কাছে এগিয়ে গিয়ে টেবিলক্লথটা টেনে নিয়ে নোটের বান্ডিলগুলো তার ওপর রাখতে লাগলো।

রয় আমার ব্যান্ডেজটা একটু ঠিক করে দে; আর কোটটা নিয়ে এসে আমার গায়ে জড়িয়ে দে। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

রয় আমার মুখের দিকে ফিরে তাকালো। ওর মুখে এমন একটা অদ্ভুত ভাব, যা আমি আগে কোনোদিন দেখিনি।

টাকাগুলো টেবিলক্লথ-এ বেঁধে উঠে দাঁড়ালো। কর্কশ লোভাতুর স্বরে বলে উঠলল, তুই আর কতদিন বাঁচবি বলে তোর মনে হয় শেট? এখন আর তোর কোনো দাম নেই। তুই চিরকালের মতো শেষ হয়ে গেছিস! আর আমি এই টাকা নিয়ে নতুনভাবে জীবন শুরু করতে পারবো, নতুনভাবে বাঁচতে পারবো। গাড়িতে তোকে জায়গা দিতে পারলাম না বলে আমি দুঃখিত, শেট। তুই কি ভাবছিস তোর দাম এই একলাখ ডলারের চেয়েও বেশী?

রয় টাকার পুঁটলিটা আমার চোখের সামনে বারকয়েক ঝাঁকালো। তুই তো সেদিন বলেছিলি, তোকে আমি দু-দুবার বাঁচিয়ে তোর সব ঋণ আমি শোধ করে দিয়েছি, তাই তো? অতএব এবারে আমি চললাম। পরে আবার বলিস না যেন, রয় নিষ্ঠুর অকৃতজ্ঞ।

হঠাৎ আমার উত্তেজিত মন ভীষণ শান্তহয়ে পড়লো। রয়কে একটুও বাধা দেবার চেষ্টা করলাম না। জানলা দিয়ে দেখলাম, মার্কারির হেডলাইট জ্বলে উঠলো। তারপর গাড়িটা মোড় নিয়ে ছুটে চললো পাহাড়ে দিকে। যে পাহাড়ের ওপারেই রয়েছে আমার কল্পনার আশ্রয়স্থল ট্রপিকা স্প্রিংস।

চেয়ারের হাতল ধরে নিজেকে সামলে নিলাম, মাথাটা ভীষণ ঝিঁঝিম্ করছে। সামনে পড়ে রয়েছে লোলার মৃতদেহ।

শরীরের সব শক্তি মিলিয়ে গিয়ে চোখে নেমে আসছে নিঃসীম অন্ধকার। জানি, আজ নয়– কাল, কেউ না কেউ আসবে এই পয়েন্ট অফ নো রিটার্নএ দেখতেই পাবে এই ঘরের আলো। ওরা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না, লোলাকে আমি খুন করিনি! জেনসনের মৃতদেহ খুঁজে পেলেও ওরা আমাকেই তার মৃত্যুর জন্য দায়ী করবে। রয় ৰা লোলা কাউকেই ওরা সন্দেহ করবে না।

বুকভরা আশা নিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় রইলাম। আসুক সেই চির অন্ধকার, আমার কপালে এঁকে দিক মৃত্যুর স্নেহ চুম্বন। সেই হবে আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

হঠাৎ মনের মধ্যে এসে ভীড় করলো হারিয়ে যাওয়া অতীতের স্মৃতি। জীবনে এই প্রথম মনে পড়লো মায়ের কথা, মনে পড়লো আমাদের ছোট্ট বাড়িটার কথা

কিন্তু রয়ের কথা মনে পড়তেই চোখ বন্ধ হয়ে এলো। অতীতের স্মৃতির টুকরো ছবিগুলো হঠাৎ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো নিদারুণ বাস্তবের কঠিন আঘাতে। ছেলেবেলার রয় আর আজকের রয়, এই দুয়ের মাঝে বিশাল ব্যবধান-আমার চিন্তাশক্তিকে পঙ্গু করে দিলো। বুকের যন্ত্রণাটা আরো বেড়ে গেলো

–শুনতে পাচ্ছি মৃত্যুর হালকা পদধ্বনি–সে আসছে নিঃশব্দ চরণে–সে আসছে।